সেপ্টেম্বর ২০২৫ □ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩২

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

Tourist Attractions in Bangladesh

Dhaka Division

বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : ঢাকা বিভাগ

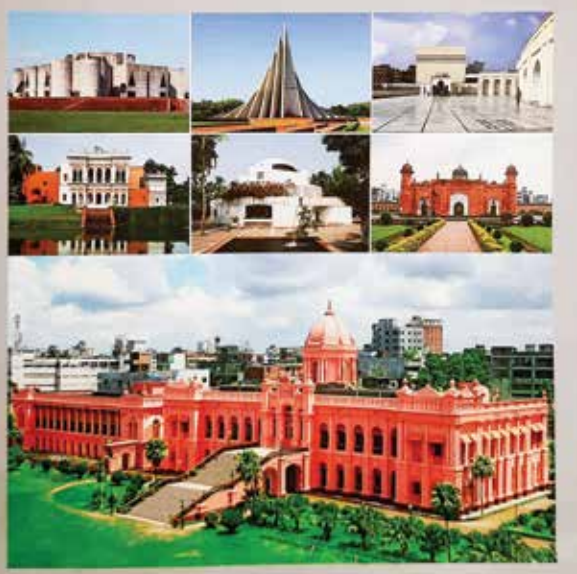

Tourist Attractions in Bangladesh

Khulna Division

বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ

Tourist Attractions in Bangladesh

Sylhet Division

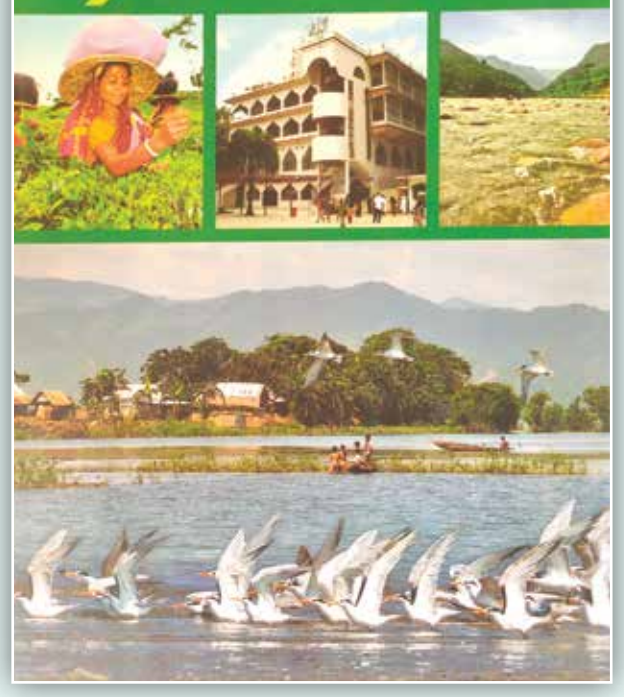

Tourist Attractions in Bangladesh

Mymensingh Division

বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : ময়মনসিংহ বিভাগ

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

সেপ্টেম্বর ২০২৫ ❑ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩২

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ৩রা সেপ্টেম্বর ২০২৫ ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)-এর সদস্যবৃন্দকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ওপর বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের আঁকা দেওয়াল চিত্র নিয়ে প্রকাশিত ART OF TRIUMPH বইটি উপহার দেন– পিআইডি

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
শাহিদা সুলতানা

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

স্টাফ রাইটার
মো. জামাল উদ্দিন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগঃ সম্পাদনা শাখা
ফোন: ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
Website: www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৭০২

মূল্য: পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

মুদ্রণে: প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/ই, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

সম্পাদকীয়

শরতের আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় যেন কোনো চিত্রশিল্পীর রংতুলির আঁচড়ে সযত্নে আঁকা সুনিপুণ এক চিত্রকর্ম। সে এক কাব্যিক অনুভূতি, যা কিছুক্ষণের জন্য হলেও মনকে ভাবুক করে তোলে। দৈনন্দিন কর্ম ব্যস্ততায় জানালার গ্রিলের ফাঁকে এক টুকরা গাঢ় নীল আকাশ আর শুভ্র মেঘের ছোটাছুটি। মানুষের নাগরিক চোখকে স্বস্তি দেয়, দেয় সতেজতা, প্রাণচাঞ্চল্য। শরতের এই মোহনীয় রূপকে– নিবন্ধ, প্রবন্ধ ও কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে এবারের সংখ্যায়।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বড়ো চালিকাশক্তি হলো নারী। নারীর শ্রম। পোশাকশিল্পের ৮০% কর্মী নারী। পোশাকশিল্প এদেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস। তাছাড়া কৃষি, ক্ষুদ্র উদ্যোগ, ব্যাংকিং ও সরকারি চাকরিতে কর্মরত রয়েছেন বিপুল সংখ্যক নারী। অনেক নারী চাকরিতে না গিয়ে নিজেরাই উদ্যোক্তা হয়েছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে সফলতা অর্জন করেছেন। এছাড়া গ্রামের নারীরা মাইক্রোক্রেডিট, এনজিও ও স্বনির্ভর কর্মসূচির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হচ্ছেন। – এ বিষয়ে একটি বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে এবারের *সচিত্র বাংলাদেশে*।

প্রকৃতির এক অনুপম লাবণ্যের নাম বাংলাদেশ। নদী, বিল, হাওর, পাহাড় আর সবুজ গ্রাম মিলিয়ে এ দেশের ভূখণ্ড যেন এক জীবন্ত কবিতা। ষড়ঋতুর আহ্বানে কখনো সবুজের মখমল, কখনো সোনালি ফসলের ক্ষেত, আবার কখনো বর্ষার টইটম্বুর স্রোত– প্রতিটি মুহূর্তেই প্রকৃতি এখনে নতুন করে রং বদলায়। বাংলাদেশ এক শান্ত, স্নিগ্ধ ও হৃদয়ছোঁয়া সৌন্দর্যের অবিচ্ছিন্ন নাম। তাইতো এ সুন্দরের রূপসুধা পানে এখানে এসেছেন বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা, চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং, ভেনিসীয় অভিযাত্রী মার্কোপোলোরা। পর্যটনের ওপরে আছে আকর্ষণীয় নিবন্ধ।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির ফলে বেড়ে যাচ্ছে গড় আয়ু। আমাদের দেশও পিছিয়ে নেই। আধুনিক চিকিৎসার অপরিহার্য স্তম্ভ ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা। যা দিন দিন আমাদের দেশের জনমানুষের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাচ্ছে এ বিষয়ে থাকছে বিশেষ নিবন্ধ। অটিজম নিয়েও থাকছে বিশেষ আলোচনা।

আমরা প্রেক্ষাগৃহে যে ঝলমলে দৃশ্যাবলী, আবেগপূর্ণ সংলাপ এবং রঙিন চরিত্রমালা প্রত্যক্ষ করি, তার নেপথ্যে থাকে এক দীর্ঘ ও পরিশ্রমসাধ্য সৃজন-অভিযাত্রা। একটি চলচ্চিত্র কখনও হঠাৎ করেই জন্ম নেয় না; এর উৎপত্তি নিহিত থাকে এক ক্ষুদ্র অথচ গভীরতর ভাবনায় একটি আইডিয়ায়–এ বিষয়ে আছে বিশেষ নিবন্ধ।

এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের নিবন্ধ, প্রবন্ধ ও কবিতা নিয়ে সাজানো এবারের *সচিত্র বাংলাদেশ* সেপ্টেম্বর সংখ্যাটি। আশা করি, সবার ভালো লাগবে।

সূচিপত্র

নিবন্ধ/ফিচার/স্বাস্থ্যকথা/ভ্রমণ কাহিনি

নারীর সংগ্রাম ও এগিয়ে চলা ৪
ড. আফরোজা পারভীন

সাক্ষরতা আনে মুক্তি ১১
মুহা. শিপলু জামান

অটিজম অভিশাপ নয়, প্রয়োজন সহমর্মিতার হাত ১৩
ম. জাভেদ ইকবাল

বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবসের গুরুত্ব ১৫
ডা. নুসরাত জাহান সোনিয়া

পর্যটন: সমৃদ্ধির সোপান ১৪
মাহবুবুর রহমান তুহিন

স্বর্গের জানালা খুলে যায় যেখানে ২২
আশফাকুজ্জামান

নতুন পর্যটন সম্ভাবনা চর ট্যুরিজম ২৮
মো. আবদুল কাদের

চলচ্চিত্র নির্মাণের যাত্রা ৩৩
সাইফুল ইসলাম মান্নু

শরৎ মেঘে আলিঙ্গন ৩৬
ইমরুল ইউসুফ

বিপ্লবের উজ্জ্বল দীপশিখা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ৩৮
অনুপ বিশ্বাস

সম্প্রতিক নাট্যচর্চায় জুলাই বিপ্লব ৪০
আবু সাঈদ তুলু

প্লাস্টিক দূষণ ও নগর জীবনের সংকট ৪৬
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

নদী মাতা যাহার ৪৭
সেলিম আউয়াল

ডেঙ্গু রোধে চাই সচেতনতা ৫০
কমল চৌধুরী

মশক নিধনে সরকারের কার্যক্রম ৫২
মো. হাসনাত আলী

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) কার্যক্রম ৫৪

গল্প

আব্বাকে মনে পড়ে আমার ৫৬
শাওন আসগর

গ্রাম চর বিলাশপুর ২১৩৭ সাল ৬২
কামাল হোসাইন

কবিতা ৫৯-৬১
অর্ণব আশিক, আতিক রহমান, খোরশেদ আলম নয়ন মনোয়ারা বেগম, আসাদুজ্জামান খান মুকুল, শাকেরা বেগম শিমু জাহাঙ্গীর চৌধুরী, গোপেশচন্দ্র সূত্রধর, কাদের বাবু

চলে গেলেন লালনকন্যা ফরিদা পারভীন ৬৪

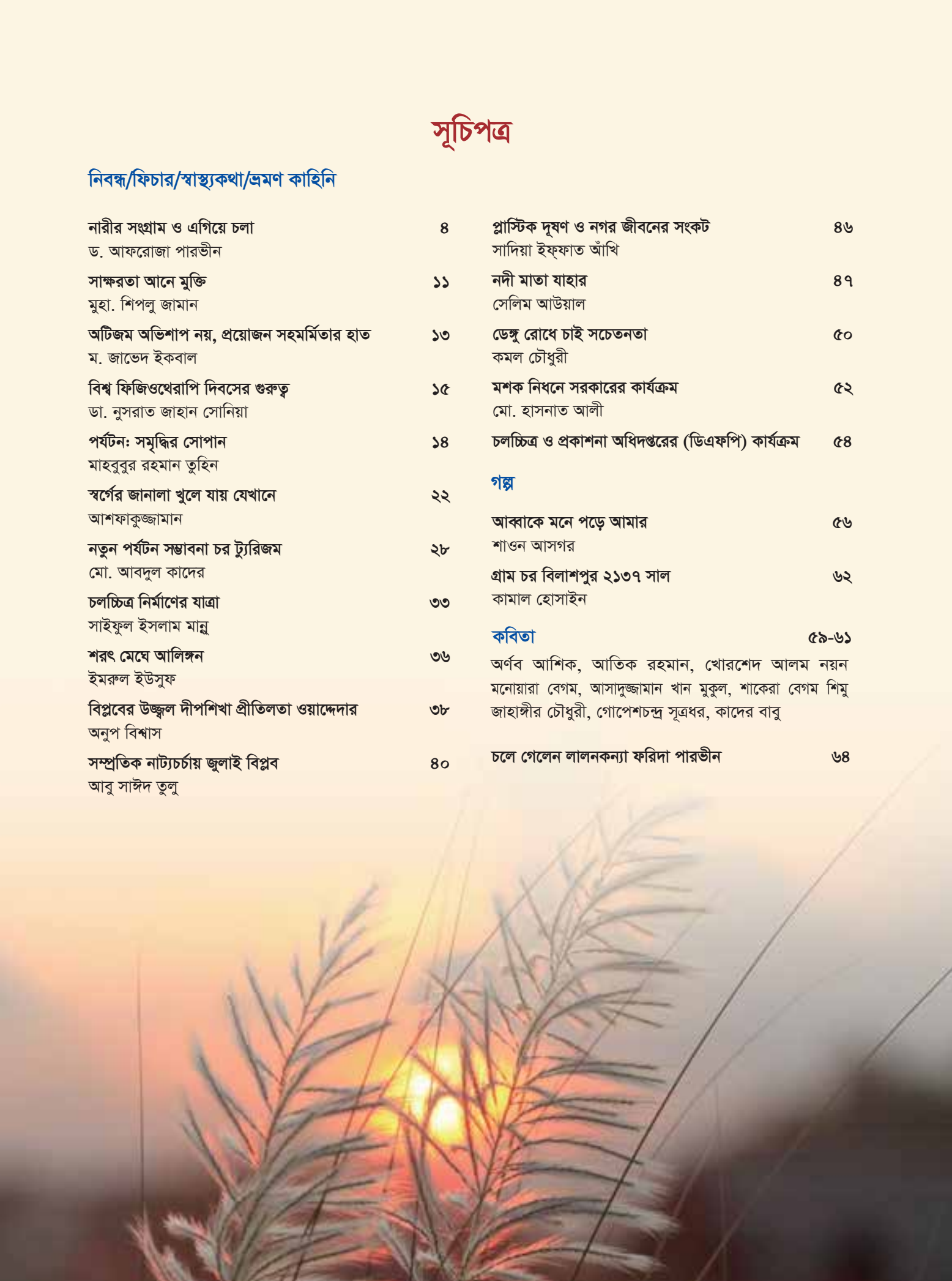

নারীর সংগ্রাম ও এগিয়ে চলা

ড. আফরোজা পারভীন

সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির বিকাশে নারী ও পুরুষের অবদান সমান। মানব সভ্যতার প্রারম্ভ থেকেই এটা চলে আসছে। কিন্তু নারীর অবদানকে অস্বীকার করার, খাটো করে দেখার একটা প্রবণতাও সেই শুরু থেকেই আছে। নারীর অবদান উপেক্ষা করে ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে নারীকে বাধ্য করা হয়েছে পেছনে থাকতে। পুরুষের সমান তালে তাদের চলতে বাধা দেওয়া হয়েছে। বাধা দেওয়া হয়েছে কখনো ধর্মের নামে, কখনো সামাজিক রীতিনীতির অজুহাত দেখিয়ে। এসব কিছুর মূলে আছে পুরষতান্ত্রিক মানসিকতা। নারীকে অবদমিত করে রাখার প্রচেষ্টা আজও চলমান। কিন্তু নারী থেমে থাকেনি, এগিয়ে গেছে দৃপ্ত পদভারে। নিজের অধিকার আদায়, মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য নিরন্তর লড়েছে। সে এক কঠিন লড়াই। সে লড়াইয়ে জয়ীও হয়েছে।

শুধু আমার দেশে নয়, পৃথিবীব্যাপী নারী ছিল অবহেলিত। আমরা যেসব দেশকে উন্নত দেশ বলি, সে দেশগুলোতেও নারীর অবস্থা ছিল নাজুক। পরিবার ও সন্তান পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নারী ছিল শিক্ষাবঞ্চিত, সম্পত্তির অধিকার তাদের ছিল না। ছিল না রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকার। এমনকি নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নেওয়ারও অধিকার ছিল না তাদের। কিন্তু নারীরা এ অন্যায় মেনে নেয়নি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নারীরা প্রতিবাদ করতে শুরু করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে পশ্চিমা বিশ্বে নারীর ভোটাধিকারের আন্দোলন শুরু হয়। আস্তে আস্তে এই আন্দোলন একটি বৈশ্বিক ধারা সৃষ্টি করে। আমেরিকায় সাফ্রেজ আন্দোলন, ফ্রান্সে নারী স্বাধীনতার আন্দোলনের মাধ্যমে নারীমুক্তির বিষয়টি ধীরে ধীরে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে জাতিসংঘের মাধ্যমে নারী অধিকারকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দেওয়া হয়।

এদেশে নারীর সংগ্রামের পথ দেখান বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ও নবাব ফয়জুন্নেসা। তারা নারী শিক্ষার প্রসার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছেন। রোকেয়ার *সুলতানার স্বপ্ন* নারী স্বাধীনতার এক প্রতীকী গ্রন্থ। *সুলতানার স্বপ্ন* গ্রন্থে তিনি এমন এক সমাজের কল্পনা করেছেন, যেখানে নারী স্বাধীন, শিক্ষিত ও সচেতন। দেশ চালাচ্ছেন নারীরা। শুধু লিখেই তিনি ক্ষান্ত হননি, মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে গেছেন। নবাব ফয়জুন্নেসা নিজে জমিদারি করেছেন। ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাজ্য পরিচালনা করেছেন। মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ভাষা আন্দোলনে রয়েছে এদেশের নারীর অসামান্য ভূমিকা। ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়েই এদেশে এসেছে স্বাধীনতা। তাই ভাষা আন্দোলনকে বলা হয় স্বাধীনতার সূতিকাগার। ভাষা আন্দোলনেই উপ্ত হয়েছিল স্বাধীনতার বীজ। সে বীজ থেকে ক্রমশ চারা হয়েছে, পুষ্ট হয়েছে সে চারা। একসময় রূপ নিয়েছে মহিরুহে। কিন্তু পরিতাপের কথা এটা যে, মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনের নারীদের কথা জানলেও আমরা তেমন করে জানি না ভাষাসৈনিক নারীদের কথা। অথচ ভাষা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নারীর ভূমিকা ছিল

অতুলনীয়। ভাষা আন্দোলন শুধু রাজধানীকেন্দ্রিক ছিল না। ছড়িয়ে পড়েছিল সারাদেশে। এদেশের আনাচেকানাচে, প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক নারী অংশ নিয়েছেন ভাষা সংগ্রামে। তাদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যকের নাম জানা গেলেও গবেষণার অভাবে এখনও অনেকের অবদানই অনুদঘাটিত। ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকেই পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ নিয়েছেন বিক্ষোভ-আন্দোলনে। জেলও খেটেছেন অনেক নারী। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে সক্রিয় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীদের সংখ্যা শতাধিক।

২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় '১৪৪ ধারা' ভেঙে যে মিছিলটি বের হয় সেই মিছিলের সামনের সারিতে ছিলেন নারীরা। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে বাহান্নর ২০শে ফেব্রুয়ারি হরতাল আহ্বান করা হলে সরকার বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে এবং পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সেদিন ১৪৪ ধারা জারি করে। এই ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্তে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরাও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। কৌশল হিসেবে মিছিলের প্রথম সারিতে মেয়েদের থাকতে বলা হয়। সেদিন পুলিশের লাঠিতে আহতও হয়েছিলেন অনেক ছাত্রী। এদের মধ্যে রওশন আরা বাচ্চু, ড. সুফিয়া আহমদ, ড. হালিমা খাতুন, সারা তৈফুর, শামসুন নাহার আহসান, ড. শরীফা খাতুন অন্যতম। বাঙালি জাতির, ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তার অসাধারণ এক উত্থানে এমন কোনো মিটিং, মিছিল, সংগ্রাম নেই যাতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নেই।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন তারা। তারা গোপন বার্তাবাহক, সেবিকা, আশ্রয়দাত্রী, সংগঠক, চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কাজ করেছেন। ক্যাম্পে ক্যাম্পে গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করেছেন। অনেকে সম্মুখযুদ্ধ করেছেন। শহিদ হয়েছেন। তাদের অবদান সেভাবে স্বীকৃতি পায়নি। একমাত্র ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম ও তারামন বিবি বীরত্বের স্বীকৃতি পেয়েছেন। অনেক মা তার একমাত্র সন্তানকে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন। সে সন্তান আর ফেরেনি। অনেক নারী তার শেষ সম্বল জমানো টাকাগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। যুদ্ধে আড়াই লাখ মা-বোন নির্যাতিত হয়েছেন। সরকার গেজেট করে তাঁদের স্বীকৃতি দিয়েছে। আগে যারা মুখ লুকিয়ে থাকতেন এখন তাদের অনেকেই প্রকাশ্যে কথা বলেন, এটাই আশার কথা। সমাজও খানিকটা বদলেছে। তারা এখন বীর মাতাদের সম্মানের চোখে দেখতে শুরু করেছে। এই এরা কেবল ভুক্তভোগী নন, ইতিহাস নির্মাতা। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ পুনর্গঠনেও তারা ভূমিকা রেখেছেন। তাদের আত্মত্যাগ নতুন প্রজন্মের জন্য প্রেরণা হয়ে আছে। নারী ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনে ছিল অগ্রভাগে। এই গণ-অভ্যুত্থানের সর্বস্তরে নারীর অবদান অসামান্য।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ বা সিডও ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ গ্রহণ করে। সনদটি ১৯৮১ সালে কার্যকর হয়।

বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে সনদে স্বাক্ষর করে এবং পরে এটি অনুমোদনও দেয়। সিডও সনদকে বলা হয়- নারীর আন্তর্জাতিক সংবিধান, কারণ এটি নারীর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমঅধিকারের কথা বলে। সনদটির মূল লক্ষ্য নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য, নিপীড়ন ও সামাজিক বঞ্চনা দূর করা। সিডও-তে ১৬টি অনুচ্ছেদে নারী অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদগুলোতে নারীকে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, বিবাহ ও পারিবারিক জীবনে সমান অধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে নারীর শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এই সনদের রয়েছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।

সিডও সনদের প্রধান লক্ষ্যগুলো হলো:

১। নারীর প্রতি সবধরনের বৈষম্য ও সহিংসতা দূর করা, (২) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও রাজনীতিতে নারীর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, (৩) বিবাহ ও পরিবারে সমান অধিকার দেওয়া, (৪) আইনি ও সামাজিকভাবে নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা।

বাংলাদেশ এই সনদে স্বাক্ষর করার মাধ্যমে নারীর অগ্রযাত্রার নতুন দরজা উন্মুক্ত করেছে। সিডও সনদ এ দেশের নারীর অগ্রগতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সনদের প্রেক্ষাপটে সরকার নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন, নারী ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন,

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইন ২০০০, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স আইন ২০১০ ইত্যাদি প্রণয়ন করেছে। সরকার বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিও গ্রহণ করেছে। এই সনদে স্বাক্ষরের ফলে নারীর ক্ষমতায়ন রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকারে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বড়ো চালিকাশক্তি হলো নারী। নারীর শ্রম। পোশাক শিল্পের ৮০% কর্মী নারী। পোশাকশিল্প এদেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস। তাছাড়া কৃষি, ক্ষুদ্র উদ্যোগ, ব্যাংকিং ও সরকারি চাকরিতে কর্মরত বিপুল সংখ্যক নারী। অনেক নারী চাকরিতে না গিয়ে নিজেরাই উদ্যোক্তা হয়েছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে সফলতা অর্জন করেছেন। প্রশাসন পুলিশ এমনকি সেনাবাহিনীর উচ্চপদেও আজ নারীরা আসীন। নারী সচিব হচ্ছেন, ডিসি হচ্ছেন, এসপি হচ্ছেন, বিচারক হচ্ছেন। গ্রামের নারী মাইক্রোক্রেডিট, এনজিও ও স্বনির্ভর কর্মসূচির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হচ্ছেন। গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা, প্রগতি, কারিতাস প্রভৃতি এনজিও নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন ও আত্মনির্ভরশীলতা গড়ে তুলতে সহায়তা করছে।

এছাড়া, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মহিলা ব্যাংক এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নারী ব্যবসায়ীরা নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নারীকে সামাজিক মর্যাদাও এনে দিয়েছে। শিক্ষা সকল সংগ্রামের চালিকাশক্তি। বর্তমানে বাংলাদেশের মেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হার ছেলেদের তুলনায় বেশি। একসময় যে মেয়েরা বিদ্যালয়ে যেতে পারত না, এখন তারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। 'নারীর জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ফ্রি', 'স্টাইপেন্ড প্রোগ্রাম', 'গার্লস স্কুল প্রজেক্ট' নারী শিক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

উচ্চশিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি, চিকিৎসা, প্রকৌশল সব ক্ষেত্রেই মেয়েরা ভালো করছে। তারা তাদের মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে প্রমাণ করছে যে, তারা ছেলেদের সমকক্ষ। কোথাও কোথাও ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে। আগে নারী শুধু গৃহিণী ছিল, এখন সমাজ বিনির্মাণে সে পুরুষের সমান অংশীদার।

বাংলাদেশে নারীরা রাজনীতিতে ভালো করছেন। নেতৃত্বের গুণাবলিতে তারা উজ্জ্বল। তাদের মাথা ঠান্ডা। সিদ্ধান্তে সঠিক, জনসংযোগ ভালো, অপেক্ষাকৃত সৎ। এদেশে নারী প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, বিরোধী দলনেতা আমরা পেয়েছি। স্থানীয় সরকারেও নারী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। এর ফলে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ নারীরা স্থানীয় সরকারে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাচ্ছেন। তারাও যে পারেন সেটা স্বচক্ষে দেখছে জাতি। সিডও সনদের লক্ষ্য পূরণে এটি একটি ইতিবাচক অগ্রগতি। এই অর্জন সিডও সনদের 'রাজনীতিতে নারীর সমান অংশগ্রহণ' ধারার বাস্তব রূপ। এই অগ্রগতি কেবল ব্যক্তিগত নয়, জাতীয় উন্নয়নের সূচক।

এতকিছুর পরও নারীর সংগ্রাম চলছে, শেষ হয়নি। নারী নির্যাতন, যৌন হয়রানি, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য, সমান বেতন ও কর্মক্ষেত্রে সুযোগের অভাব এখনো বড়ো বৈষম্য। পারিবারিক সহিংসতা আজও সমানভাবে বিরাজমান। বরং প্রযুক্তির উন্নতির কারণে দিন দিন নির্যাতনের নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কার হচ্ছে। সাইবার বুলিং ও অনলাইনে নির্যাতন নিত্যকার ঘটনা। তাই মানসিকভাবে ভালো নেই নারী।

ধর্মীয় ব্যাখ্যা, বাধা, সামাজিক কুসংস্কার আগের মতোই আছে। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতারও পরিবর্তন হয়নি। আজও তারা সমানভাবে নারীকে দমিয়ে রাখতে চায়। তাদের এই মানসিকতা ও ধর্মীয় সামাজিক বাধা নারীর অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত করে, ব্যাহত করে। তাই শুধু আইন দিয়ে হবে না, প্রয়োজন মানসিক ও সামাজিক পরিবর্তনের।

বাংলাদেশে সিডও সনদের অনেক ধারা ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে, তবে কিছু ধারায় এখনো সংরক্ষণ (reservation)

রয়েছে। বিশেষ করে পারিবারিক ও ধর্মীয় আইনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সমান অধিকার কার্যকর হয়নি।

তবে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার নারীকে আইনের শাসন দেবার চেষ্টা করছে। যেমন নারী নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, উইমেন হেল্পলাইন ১০৯, ওমেন পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান। এসব উদ্যোগ নারীর নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এছাড়া জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG-5) অনুসারে Gender Equality অর্জনে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের Gender Gap Report-এ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষ দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

শিশু বয়স থেকেই ছেলেমেয়ে উভয়কে সমতার শিক্ষা দিতে হবে। মিডিয়ায় নারীকে সম্মানজনকভাবে উপস্থাপন করতে হবে, কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ, নিরাপদ যাতায়াত ও পরিবারে পারস্পরিক শ্রদ্ধা এসব বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। সিডও সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন, শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ, আইন প্রয়োগে কঠোরতা এই তিনটি বিষয় বাস্তবায়িত হলে আমরা বলতে পারব— নারী-পুরুষে সমতা আছে।

নারীর সংগ্রামে যেদিন পুরুষ পাশে এসে দাঁড়াবে সেদিনই নারী পাবে সমান মর্যাদা। নারীর সম্মান মর্যাদা অধিকার মানবাধিকারের অংশ। এই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজ, রাষ্ট্র ও পরিবার সর্বত্র নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে সমান সুযোগ দিতে হবে নারীকে। সে সুযোগ সে পাবে তার যোগ্যতার ভিত্তিতে, দয়ায় নয়। তবেই অগ্রগামী হবে নারী।

নারীর সংগ্রাম সহজ নয়, এক দীর্ঘ পথ, কাঁটা বিছানো সে পথ। কিন্তু এই কাঁটা পায়ে দলে এগিয়ে যাচ্ছে নারী। এগিয়ে যেতে হবে। পিছিয়ে পড়লে চলবে না। তবেই আসবে বিজয়। অর্জিত হবে সমঅধিকার। সিডও সনদ নারীর লড়াইয়ের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। নারীর স্বাধীনতা মানে সমাজের অগ্রগতি, কারণ নারীকে বাদ দিয়ে কোনো উন্নয়ন টেকসই হতে পারে না। তাই প্রয়োজন, নারীকে সুযোগ নয়, অধিকার দেওয়া।

নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। তারা আপাতত পুরুষের সমান মনে হলেও তা নয়। নারী বিভিন্নভাবে বঞ্চিত, পুরুষের দ্বারা নির্যাতিত। এসব বৈষম্যের অবসান হওয়া দরকার। তাই নারীর সংগ্রাম চলছে। এই সংগ্রাম চলবে যতদিন না পৃথিবীর প্রতিটি নারী-পুরুষের মতো একই অধিকার ও মর্যাদায় সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ লক্ষ্যে সরকার যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, এর সাফল্য এবং সামাজিক ইতিবাচক মনোভাব নারীর অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ড. আফরোজা পারভীন: সরকারের সাবেক যুগ্ম সচিব, লেখক ও গবেষক, parveenwriter@yahoo.com

সাক্ষরতা আনে মুক্তি

মুহা. শিপলু জামান

ছোটোবেলা থেকে আমরা জেনেছি 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড'। শিক্ষাই আমাদের জীবন এবং জীবনধারাকে পাল্টাতে পারে। শিক্ষা ছাড়া কোনো দেশ বা জাতি উন্নতি করতে পারে না। বিশ্বের বুকে যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি আধুনিকতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তিতে ততই সমৃদ্ধ। টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা জরুরি। শিক্ষা মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে এবং তাদের জীবনধারাকে উন্নত করে। তবে শিক্ষার্জনের প্রথম সোপান হচ্ছে সাক্ষরতা। টেকসই উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্য হলো শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ হিসেবে সাক্ষরতাকে পাশে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। সাক্ষরতা ও উন্নয়ন একইসূত্রে গাঁথা। নিরক্ষরতা উন্নয়নের অন্তরায়। টেকসই সমাজ গঠনের জন্য যে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন, তা সাক্ষরতার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।

সাক্ষরতা বলতে সাধারণভাবে মানুষের অক্ষর জ্ঞানকে বুঝায় অর্থাৎ মানুষের পড়া ও লেখার ক্ষমতা। তবে সাক্ষরতার ব্যাপ্তি অনেক বিস্তৃত; শুধু অক্ষরজ্ঞান নয়, নিজের মৌলিক চাহিদা বিষয়ে সচেতনতা, তথ্য অধিকার তথা তথ্য জানা, বুঝা এবং বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা, যোগাযোগের সক্ষমতা, ডিজিটাল ও আর্থিক জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ও সাক্ষরতার অন্তর্গত। মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার হচ্ছে শিক্ষা আর শিক্ষার প্রথম স্তর হচ্ছে সাক্ষরতা যা তাদের আত্মশক্তি বিকাশে সাহায্য করে এবং সমাজে টিকে থাকতে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অপরিহার্য উপাদান। সাক্ষরতার মানুষকে তার মৌলিক এবং সামাজিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে আর সাক্ষরতার হার বাড়া মানেই দারিদ্র্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা।

শিক্ষিত ও সাক্ষরতা এক জিনিস নয়। একজন মানুষ যখন প্রাতিষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়, তখন আমরা তাকে শিক্ষিত বলতে পারি। কিন্তু সাক্ষর মানে হলো প্রাথমিক জ্ঞান বা অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন মানে একজন ব্যক্তি কেবল বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত হন। সাক্ষরতা নিজের নাম লেখা বা সাধারণ কিছু পড়া ও লেখার সক্ষমতা ও প্রাথমিক জ্ঞানকে বুঝালেও কার্যকরী সাক্ষরতা হলো দৈনন্দিন জীবনের কাজগুলো যেমন– নির্দেশনা বোঝা, বিল পড়া বা ছোটো চিঠি লেখার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা কিংবা বাজারের তালিকা করা, রাস্তার সাইনবোর্ড ও বাসার ঠিকানা পড়া, চিঠিপত্র পড়া, মোবাইল নম্বর চেনা, টেলিফোন ও মোবাইল করতে পারা, নম্বর সেভ করতে পারা, সর্বোপরি নিজের নাম লিখতে পারা এবং স্বাক্ষর কিংবা দস্তখত করতে পারা। এগুলোর পাশাপাশি বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও যোগাযোগের সক্ষমতাকে ডিজিটাল সাক্ষরতা বলে যা একুশ শতকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে সকল যুগে, সকল সময়ে মানুষকে হিসাবনিকাশ, আয়-ব্যয়, বিনিয়োগ, ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং অর্থনৈতিক ধারণাগুলো জানতে ও বুঝতে হয় যাকে আমরা আর্থিক সাক্ষরতা বলে বুঝি। সকল পেশার মানুষ যেমন একজন ফেরিওয়ালা বা একজন সবজি বিক্রেতারও হিসাব জ্ঞান থাকতে হয় এবং প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ তা রপ্ত করে নেয়। একটি আধুনিক, সচেতন ও শিক্ষিত সমাজ গঠনে সকল প্রকার সাক্ষরতার ভূমিকা অনস্বীকার্য এবং এদের সমন্বয় জরুরি।

ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমাজের মধ্যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ১৯৬৫ সালের ১৭ই নভেম্বর জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো) ৮ই সেপ্টেম্বরকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। বিশ্বজুড়ে নিরক্ষরতা দূর করে সাক্ষরতা এবং শিক্ষার হার বাড়ানোর প্রচেষ্টা করে ইউনেস্কো। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সকল দেশ, সমাজসেবী সংগঠন একসাথে যথাযথ উৎসাহ-উদ্দীপনায় দিবসটি পালন করে থাকে। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে প্রথম সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এবছর 'প্রযুক্তির যুগে সাক্ষরতার প্রসার' বা ইংরেজিতে 'Promoting Literacy in the Digital Era'– প্রতিপাদ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়। ডিজিটাল বিশ্বে সাক্ষরতার গুরুত্ব এবং প্রযুক্তির সাহায্যে শিক্ষার প্রসারের ওপর জোর দিয়ে ইউনেস্কো প্রতিপাদ্যটি নির্ধারণ করেছে। ডিজিটালাইজেশনের যুগে সাক্ষরতা একটি দক্ষতা এবং সামাজিক হাতিয়ার হিসেবে পরিবর্তিত হচ্ছে, যা পরিবর্তনশীল বিশ্বের জন্য অপরিহার্য প্রতিপাদ্যটি তাই যথাযথ ও সময়োপযোগী হয়েছে।

দিবসটি ঘোষণার পর দেশে দেশে সাক্ষরতার সঠিক সংজ্ঞায় ভিন্নতা ছিল তাই সার্বজনীন একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ জরুরি হয়ে পড়ে। প্রেক্ষিতে ১৯৬৭ সালে ইউনেস্কো সার্বজনীন একটা সংজ্ঞা নির্ধারণ করে। তখন শুধু কেউ নাম লিখতে পারলেই তাকে সাক্ষর বলা হতো। পরবর্তীতে প্রায় প্রতি দশকেই এই সংজ্ঞায় পরিবর্তন এসেছে এবং ১৯৯৩ সালে একটি সংজ্ঞায় ব্যক্তিকে সাক্ষর হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়। যথা: ১। ব্যক্তি নিজ ভাষায় সহজ ও ছোটো বাক্য পড়তে পারবে; ২। নিজ ভাষায় সহজ ও ছোটো বাক্য লিখতে পারবে এবং ৩। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ হিসাবনিকাশ করতে পারবে। তবে এই সংজ্ঞাটিও এখন পরিবর্তনের দাবি রাখে কেননা বর্তমানে সর্বক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার জানা অতীব জরুরি হয়ে পড়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, দেশে ১৯৭১ সালে সাক্ষরতার হার ছিল ১৬ দশমিক ৮ ভাগ, যা ১৯৯১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫ দশমিক ৩। আর ২০০১ সালে সাক্ষরতার হার ছিল ৪৭ দশমিক ৯। ৮ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের দৈনিক প্রথম আলোর তথ্য মতে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ প্রতিবেদন (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪) অনুযায়ী দেশের সাত বছর ও তদূর্ধ্ব জনগোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৭৭ দশমিক ৯ শতাংশ। অর্থাৎ প্রায় ২২ দশমিক ১ শতাংশ জনগোষ্ঠী এখনো নিরক্ষর। উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের জন্য তাদের সাক্ষরজ্ঞান ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করা অত্যন্ত জরুরি। স্বাধীন বাংলাদেশে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য জাতিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের

সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার সন্নিবেশিত হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ অনুযায়ী ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সি বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সি নিরক্ষর নারী-পুরুষকে সাক্ষরতা, জীবিকায়ন দক্ষতা ও জীবনব্যাপী শিক্ষা দেওয়ার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

সাক্ষরতা স্বাধীনতার পথে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তির প্রথম ধাপ। এটা ব্যক্তি ও সমষ্টির উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে দারিদ্র্য ও অসমতা হ্রাস করে, সম্পদ তৈরি করে। পুষ্টি ও গণস্বাস্থ্যের সমস্যা দূর করে। দেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলো থেকে দূরে রেখে আমাদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন বা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষাজীবন অর্থাৎ শৈশবের শিক্ষায় সাক্ষরতার যুগোপযোগী মান নিশ্চিত করা যেমন জরুরি, কর্মরত অবস্থায় সাক্ষরতা অর্জন ও বয়স্ক মানুষের কার্যকর সাক্ষরতাও উৎপাদনশীলতায়, দক্ষতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম। স্বল্প দক্ষতা ও অদক্ষতা বাংলাদেশের উন্নয়ন ও সম্ভাব্য অগ্রযাত্রায় বাধার বেষ্টনী রচনা করছে, যা অতিক্রম করা আমাদের জন্য অবশ্যকরণীয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি ৪ নম্বর লক্ষ্যে) অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা এবং সবার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষা সুযোগ নিশ্চিতকরণের কথা বলা হয়েছে। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যে দক্ষ ও মানসম্পন্ন শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের ওপর। বাংলাদেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, এনজিও ও সুশীল সমাজ এসডিজি-৪ নিয়ে নানামুখী কাজ করছে। অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করছে।

বাংলাদেশকে প্রযুক্তিনির্ভর জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে এবং নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকার সদা সচেষ্ট। এ লক্ষ্যে ৬৪টি জেলায় ৫০২৫টি কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপন করে নব্য সাক্ষরদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, উপশহরে বিদ্যালয় স্থাপন, কমিউনিটি শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ, খাদ্যের জন্য শিক্ষা কর্মসূচি, উপবৃত্তির মাধ্যমে ছাত্র ভর্তি, বিদ্যালয় ত্যাগের প্রবণতা কমানো, মাধ্যমিক পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ, মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান ইত্যাদি নানারকম কার্যাবলি চলমান আছে এবং পরিস্থিতি বিবেচনায় আরও নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। আমাদের প্রত্যাশা সাক্ষরতা বৃদ্ধি এবং নিরক্ষতা হ্রাসে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে সকলের একযোগে কাজ করতে হবে তবেই আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব– ইনশাল্লাহ। আসুন আমরা সকলে দেশের প্রতি প্রান্তরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেই, নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে পুরোপুরি মুক্ত করি প্রিয় বাংলাদেশকে।

তথ্যসূত্র

https://www.dainikshiksha.com/bn/news/international-literacy-day-and-economic-liberation-342084

https://www.prothomalo.com/education/higher-education/ccnyrzxdst

https://www.bonikbarta.com/editorial/kW2Iv465ax89YwGJ

https://www.jugantor.com/tp-ub-editorial/87996

https://www.google.com/

https://chandpurprotidin.com

মুহা. শিপলু জামান: পরিচালক, ডিএফপি

অটিজম অভিশাপ নয়, প্রয়োজন সহমর্মিতার হাত

ম. জাভেদ ইকবাল

মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার সদর ইউনিয়নের তরুণ আব্দুল পারিশ। ছোটোবেলা থেকেই তার আচরণে বিভিন্ন রকম অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পেতে থাকে। এ অবস্থাতেই কেটে যায় বছরের পর বছর। এই দীর্ঘ সময় আব্দুল পারিশকে কোনো ধরনের চিকিৎসা দেওয়া হয় নি। তার পরিবার প্রথমদিকে বুঝতেই পারেনি পারিশের সমস্যা মূলত কী। পরবর্তীতে তারা পাবনার মানসিক হাসপাতালে গেলেও সেখান থেকে তাকে ফেরত পাঠানো হয়। পারিশের ভাই অহিদুল ইসলাম গণমাধ্যমকে জানান, 'স্বাভাবিক মানুষের যে চলাফেরা, মানুষকে সঙ্গ দেওয়া, পারিশ এমন কিছু করত না। সবসময় একা একা থাকত। খাবার খেত না। মায়ের সাথেও খারাপ ব্যবহার করত।' আব্দুল পারিশের বাড়ি থেকে অল্প দূরত্বে থাকেন আরেক যুবক

রঞ্জন চন্দ্রের পরিবার। সেখানে গিয়ে দেখা গেল রঞ্জনের পা শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা। পাঁচ বছর ধরে একই অবস্থায় রাখা হয়েছে তাকে। দুই-তিনমাস পর পর তার পায়ের শিকল খুলে দেওয়া হয় বলে জানান তার বাবা রুপন চন্দ্র। কিন্তু শেকল দেওয়ার কারণ কী? এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, তার ছেলে আশপাশের বাড়িঘরে যায়, লোকজনকে বিরক্ত করে। পরে সবার চাপে তিনি পায়ে শিকল দিয়ে রেখেছেন। ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করলেও অন্য ছাত্ররা অভিযোগ দেওয়ায় ফিরিয়ে আনতে হয়। রঞ্জনকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে জানতে পারেন তার ছেলে 'অটিজম'–এ আক্রান্ত। বাংলাদেশের আনাচেকানাচে এখনো অনেক পরিবারই আছে, যারা অটিজম সঠিকভাবে বুঝতে বা শনাক্ত করতে পারেন না। ফলে সেসব পরিবারের জন্ম নেওয়া বিশেষ শিশুটিকে বছরের পর বছর সমাজের সবার কাছ থেকে আলাদা করে রাখা হয়। সামাজিক কোনোও আচার-অনুষ্ঠানে তাদের অংশগ্রহণ তো দূরের কথা অনেক ক্ষেত্রে সমাজের মানুষেরাও তাদের দূরে সরিয়ে রাখে এক ধরনের কুসংস্কার থেকে।

চিকিৎসকরা বলছেন, অটিজম কোনো রোগ নয়। এটি মস্তিষ্কের বিকাশজনিত এক ধরনের সমস্যা যার কারণে একটি শিশু সামাজিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না। অটিজমে আক্রান্ত শিশুর ডিএনএ কপি নম্বর ভ্যারিয়েন্ট নামক ত্রুটি বহন করে। কিন্তু দ্রুত শনাক্ত করতে পারলে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারলে এই শিশুরাও অন্যান্য শিশুদের মতো উন্নতি করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের অটিজম সোসাইটির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় এক শতাংশ অটিজম সমস্যায় ভুগছে। বাংলাদেশে প্রতি ১০ হাজারে ১৭ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বা অটিজম আক্রান্ত মানুষ রয়েছেন। রাজধানীর বিএসএমএমইউ হাসপাতালটির শিশু নিউরোলজি বিভাগে প্রতিদিন দেড়শো থেকে দুইশো অটিজম শিশু চিকিৎসা নিতে আসে। সে হিসাবে নতুন-পুরানো মিলিয়ে প্রতি মাসে ৩০ হাজারেরও বেশি অটিজমে আক্রান্ত শিশু এখানে চিকিৎসা নিতে আসেন। এছাড়া সারাদেশের ৩৪টি মেডিকেল হাসপাতালে অটিজমে আক্রান্তদের চিকিৎসায় একটি করে শিশু বিকাশ কেন্দ্র রয়েছে। এর বাইরেও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। বিএসএমএমইউ-এর ইনস্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক নিউরো ডিজঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম (ইপনা) পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, দেশে প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে ১ দশমিক ৭ জন অটিজম আক্রান্ত। গ্রামের চেয়ে শহরে বাড়ছে অটিজম শিশু। গ্রামে প্রতি ১০ হাজারে ১৪ জন। অর্থাৎ প্রতি হাজারে ১ দশমিক ৪ জন। শহর এলাকায় প্রতি ১০ হাজারে ২৫ শিশু, যা প্রতি হাজারে ২ দশমিক ৫ জন। তবে কন্যাশিশুর চেয়ে অটিজম আক্রান্ত ছেলেশিশুর সংখ্যা আড়াইগুণ বেশি। বর্তমানে দেশে ১৬-৩০ মাস বয়সের শিশুদের মধ্যে অটিজমের হার প্রতি ১০ হাজারে ১৭ জন। আনুপাতিক হারে তা প্রতি হাজারে ১ দশমিক ৭।

অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের সামাজিক যোগাযোগ ও দক্ষতার ব্যবহারজনিত সীমাবদ্ধতা এবং পড়াশুনার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যার লক্ষণগুলো শিশুর বয়স তিন বছর হওয়ার পূর্বেই দেখা দিতে শুরু করে। বাবা-মা অনেক ক্ষেত্রে বিষয়গুলো বুঝতেও পারেন না অথবা ধরে নেন এই সমস্যাগুলো শিশুটি বড়ো হওয়ার সাথে সাথে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু অটিজমের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো এমনিতে ঠিক হয় না, বরং বড়ো হওয়ার সাথে সাথে লক্ষণগুলো বেড়ে যায়। সুতরাং শিশুর মধ্যে অটিজমের লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করা উচিত। সামাজিক যোগাযোগের বিবেচনায় অটিজম আক্রান্ত শিশুদের কথা বলা এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। তারা অন্যের সাথে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগে সীমাবদ্ধতায় ভোগে বা করতে পারে না। কারণ তারা

সাবলীলভাবে ভাষা প্রকাশে অক্ষম। অনেক ক্ষেত্রে শব্দ এবং বাক্য গঠন করতে বা বলতে পারে না। কোনো কোনো সময় আগে যে শব্দগুলো বলত হঠাৎ করে তা বলা কমে যায় বা সেগুলোও আর বলে না। সামাজিক শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারে না, আবার ছোটো করে কথা বলে যেমন- 'হাই-বাই' অথবা ছোটো আলাপ 'আপনি কেমন আছেন?' প্রশ্নের জবাব না দেওয়া, অন্যরা কী বলছে তার প্রতি কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখানোও অটিজমে আক্রান্তদের মধ্যে দৃশ্যমান। তবে এদের মাঝে সামগ্রিকভাবে সামাজিক অভিবাদনের অভাব দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে অন্যের কথার পুনরাবৃত্তি করে বা অন্যরা যা বলে সেই কথাই হুবহু বলে। পুনরাবৃত্তিমূলক কথা বা ভোকাল স্টেরিওটাইপ পুনরাবৃত্তিপূর্ণ ভোকাল শব্দ বা পুনরাবৃত্তি বাক্য বা কথোপকথন বার বার বলে। যেমন- একই শব্দ বা বাক্য বার বার বলা, একই গান বা ছড়া বার বার বলা, অন্যের কথা বার বার বলা ইত্যাদি।

অটিস্টিক শিশুর পড়াশুনা বা একাডেমিক কাজের সময় আচরণগত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ এবং শ্রেণিকক্ষে অধ্যয়নে সমস্যা দেখা যায়। তারা লেখা ও পড়ার অসুবিধা, বর্ণমালা, সংখ্যা, শব্দ, গাণিতিক গণনা শেখা এবং সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয়ের ক্রিয়াকলাপে সমস্যায় পড়ে। এরমধ্যে ক্লাসে অংশ না নেওয়া, হাত না উঠানো বা শিক্ষকদের প্রশ্নের জবাব না দেওয়া, চুপচাপ ক্লাসে বসে থাকা, ক্লাসে কী বলা হচ্ছে তা না শোনার প্রবণতা উল্লেখযোগ্য। অটিজম আক্রান্ত শিশুদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল থাকে। তারা কী শিখেছে তা দ্রুত ভুলে যায় এবং দীর্ঘ সময় ধরে তথ্য মনে রাখতে পারে না। অনেক সময় আগে যা শিখেছে তা হঠাৎ করে ভুলে যায় বা আগের শেখা বিষয়গুলো বলতে পারে না। তবে অনেকের ক্ষেত্রে তাদের কোনো একটি বিষয়ে দক্ষতা ভালো থাকে।

তাদের প্রতিদিনের জীবনযাপনে স্বনির্ভর কার্যক্রম যেমন গোসল করা, খাওয়া, জামাকাপড় পরা ইত্যাদির ক্রিয়াকলাপ অন্তর্ভুক্ত। অটিজম আক্রান্ত শিশুদের এই ধরনের কার্যকলাপে সহায়তা এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। এ সকল কাজের কেবলমাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ সম্পাদন করতে পারে তবে পুরো কাজটি নয় উদাহরণস্বরূপ– হাত ধোয়া, গোসল করা, কাপড় পরা, টয়লেট করা ইত্যাদির মতো দীর্ঘ কোনো কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। এগুলোর কয়েকটি পদক্ষেপ নিজে করতে পারে তবে পুরো কাজটি শেষ করতে পারে না। যেমন- তারা স্বতন্ত্রভাবে গোসল করবে তবে পুরো শরীর পরিষ্কার করার জন্য সাবান ব্যবহার করবে না। প্রতিদিনের ক্রিয়াকলাপগুলো করার জন্য তাদের বার বার মনে করিয়ে দিতে হয়। শিশুদের প্রতিদিন দাঁত ব্রাশ করা, জুতা পরা ইত্যাদিসহ সমস্ত ক্রিয়াকলাপের জন্য নিয়মিত তাকে স্মরণ করে দিতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক বা অত্যধিক আচরণ যেমন- অন্যকে আঘাত করা, নিজেকে আঘাত করা, দেয়ালে মাথা ঠুকা, নিজের চুল টেনে ছিঁড়া, নিজের হাতে কামড় দেওয়া, অন্যকে থুতু দেওয়ার মতো আচরণ করতে পারে তারা। তারা নিজেরা একা থাকতে পছন্দ করে।

গ্রামের দিকে অনেকেই জানেন না অটিজম কী, সেটা যে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী নয়, সেটা বুঝে উঠতে পারেনি। অনেকে এখনো বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের পাগল মনে করে, আবার অনেকে মনে করে যে- বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, মানে বোকা। কিন্তু এসব ধারণার কোনোটাই ঠিক না। বহুদিনের প্রাচীন ধারণা মোতাবেক বেশির ভাগ পরিবারই তাদের অটিজম আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা বা শিক্ষার বাইরে রাখছে। তবে সে অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে ধীরে ধীরে। এখন অনেক বাবা-মা চিকিৎসার জন্য ছেলেমেয়েদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসেন। দেশের মেডিকেল কলেজগুলোর ১৬টিতে শিশু বিকাশ কেন্দ্র রয়েছে যেগুলোতে অটিজম শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। তবে, ঢাকার বাইরের বিভিন্ন শহর বা গ্রাম পর্যায়ে রয়েছে কেবল সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিবন্ধী সাহায্য ও সেবাকেন্দ্র। ফলে অটিজম বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগগুলো শহরে ঘরে ঘরে যতটা পৌঁছে যাচ্ছে, শহরের বাইরের পরিবারগুলোর কাছে তা অনেকটাই দূরবর্তী সুযোগ-সুবিধার মাঝে আটকে আছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে শৈশবে ব্যবস্থা নেওয়া গেলে অটিজম নিয়ে জন্ম নেওয়া শিশু প্রাপ্ত বয়সে অনেকটাই স্বাভাবিক হতে পারে। শৈশবে ব্যবস্থা নেওয়া বলতে বোঝায় জন্মের ১৮ মাস থেকে ৩৬ মাস বয়সের মধ্যে অটিজম শনাক্তকরণ ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিশুকে সঠিক চিকিৎসা দেওয়া। এ ধরনের শিশুর প্রধান চিকিৎসা স্পিচ থেরাপি, নিওরোবিহেভিওরাল থেরাপি। অতিরিক্ত আচরণগত সমস্যা, ঘুমের সমস্যা ও শারীরিক সমস্যার জন্য মেডিকেল চিকিৎসা এবং বিশেষ স্কুলে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

আমাদের দেশে অটিজম সম্পর্কে সাধারণ জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই নেতিবাচক। অনেকে এ রোগকে সৃষ্টিকর্তার অভিশাপ বলে মনে করেন। ফলে অটিজম আক্রান্তদের জন্য সমাজে বসবাস করাটা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। রোগের প্রাথমিক লক্ষণ প্রকাশ পেলে অর্থাৎ শিশুর শৈশবকালেই ব্যবস্থা নিলে অটিস্টিক শিশুদের অনেকটাই স্বাভাবিক জীবনে নিয়ে আসা সম্ভব। আর এজন্য চাই সবার সচেতনতা। আমরা সচেতন হলেই অটিস্টিক মানুষের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাবে। এই মানুষগুলো পাবে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ।

ম. জাভেদ ইকবাল: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভস, ঢাকা

বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবসের শুভেচ্ছা

ডা. নুসরাত জাহান সোনিয়া

বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যাচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞান, মানব সভ্যতা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির ফলে বেড়ে যাচ্ছে মানব গড় আয়ু। আমাদের দেশও পিছিয়ে নেই। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে আমাদের চিকিৎসা খাত। আধুনিক চিকিৎসার অপরিহার্য স্তম্ভ ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা। যা দিন দিন আমাদের দেশের জনমানুষের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাচ্ছে এবং আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হচ্ছে। গত ৮ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে পালন করা হয় 'বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস'। ফিজিওথেরাপি বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়। আসুন ফিজিওথেরাপি সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক আলোচনা উপস্থাপন করা যাক।

ফিজিওথেরাপি একটি বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন বা মুভমেন্টকে চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করে, সাথে সাথে তাপমাত্রার তারতম্য যেমন গরম, ঠান্ডা কিংবা বৈদ্যুতিক বা চুম্বকীয় তরঙ্গকে চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করে। ফিজিওথেরাপি শুধু একটি চিকিৎসা নয়, এটি এক সমন্বিত ব্যবস্থা যা রোগীর রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা, উপশম, দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন সর্বোপরি রোগীর শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সকল দিক বিবেচনা করে চিকিৎসা পদ্ধতিকে রোগী অনুযায়ী নির্ধারণ করে। ফিজিওথেরাপির বিস্তার

চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। অর্থোপেডিক, রিউমাটোলজি, নিউরোলজি, পেডিয়াট্রিক, গাইনোকলজি, পেলিয়াটিভ, কার্ডিও-পালমোনারি, স্পোর্টস, অরগোনমিকস, জেরিয়াট্রিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ স্টেক হোল্ডার ফিজিওথেরাপিস্টগণ।

ওষুধ নয়, সার্জারি নয়, ব্যথা নিরাময়ে ফিজিওথেরাপি হতে পারে আপনার সহায়। অনেক রোগী সার্জারি এড়িয়ে ফিজিওথেরাপি নিয়ে সুস্থ থাকে। এমনকি সার্জারি পরবর্তী চিকিৎসায় ফিজিওথেরাপি অপরিহার্য। আইসিইউতে পেলিয়াটিভ কেয়ারে ফিজিওথেরাপি সারা বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন নিউরোলজিক্যাল কেস যেমন- স্ট্রোক, জিবিএস, পারকিনসন্সসহ নিউরাল ডিসঅর্ডারে অপরিহার্য চিকিৎসা ফিজিওথেরাপি। প্রতিবন্ধিতা চিকিৎসায় সারা দুনিয়ায় পুনর্বাসন চিকিৎসার অগ্রদূত ফিজিওথেরাপিস্টগণ। এছাড়া আগুনে পোড়া রোগীর ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা সাম্প্রতিক সময়ের মাইলস্টোন দুর্ঘটনা পরবর্তী চিকিৎসায় স্পষ্ট হয়েছে। আমাদের একটি বিশেষজ্ঞ টিম এখনো তাদের জন্য ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন, জেনে আশা করি আপনারা আশ্বস্ত হবেন। এজন্যই ফিজিওথেরাপিস্টদের বলা হয় রিহ্যাবিলিটেশন স্পেশালিস্ট। নিকট অতীতে করোনা মহামারি সারা বিশ্বে এক গভীর ক্ষত তৈরি করে গেছে, যা দেখিয়ে গেছে আমাদের চিকিৎসা খাতের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব। যদিও এক্ষেত্রে সারা বিশ্বে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। সারা বিশ্বের পাশাপাশি বাংলাদেশেও করোনাকালীন এবং করোনা-পরবর্তী কার্ডিও-পালমোনারি রিহ্যাবে চেস্ট ফিজিওথেরাপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

বর্তমান সময়ে ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া এবং পোস্ট ভাইরাল অর্থোপেডিক যা রোগ পরবর্তী দীর্ঘমেয়াদি জয়েন্ট প্রদাহ, বাত ব্যথা নিয়ে আসে। এছাড়া যে-কোনো অর্থোপেডিক কিংবা রিমাটোলজিক্যাল পেইন ম্যানেজমেন্টে ফিজিওথেরাপি অগ্রগণ্য। তাই ফিজিওথেরাপিস্টদেরকে বলা হয় পেইন স্পেশালিস্ট। সুতরাং রোগীর চিকিৎসায় দীর্ঘমেয়াদি ব্যথানাশক বা স্টেরয়েড সেবন থেকে বিরত থেকে ফিজিওথেরাপি হতে পারে একটি স্থায়ী এবং প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি।

আমাদের দেশে প্রতিদিনই অসংখ্য রোগীর ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা প্রয়োজন হয়, অনেকের ক্ষেত্রে যা অপরিহার্য। যদিও সঠিক এবং সময়মতো রেফারেলের অভাবে রোগীরা ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার প্রকৃত সুফল লাভ করতে পারছেন না। এক্ষেত্রে মোটা দাগে প্রশ্ন হলো– ফিজিওথেরাপি পেশাজীবী কারা এবং কোথায় আমরা রোগী পাঠাবো? অনেক পেশাজীবী চিকিৎসকগণও এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন এবং সাধারণ রোগীরাও সঠিক দিকনির্দেশনা পান না। ফিজিওথেরাপি পেশাজীবীগণ স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাঁচ বছরের স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন, যা স্বতন্ত্র পেশাজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক মানদণ্ড। এছাড়া অনেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে থাকেন। অনেক চিকিৎসক অজ্ঞানতা বসত সঠিক প্রফেশনালদের কাছে রোগী না পাঠিয়ে হাতুড়ে বা টেকনিশিয়ান থেরাপিস্টদের কাছে রোগী রেফার করেন যা সেবার মান ক্ষুণ্ন করে। তাই রোগীর রেফারেলের জন্য আপনারা সঠিক প্রফেশনালকে বেছে নিন। এক্ষেত্রে সিআরপি হতে পারে একটি আস্থার নাম। এছাড়া ফিজিওথেরাপিস্টের শিক্ষাগত ব্যাকগ্রাউন্ড বা ডেজিগনেশন দেখে রোগী রেফার করুন।

পরিশেষে সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করি এবং ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার উত্তরত্তোর সমৃদ্ধি কামনা করি। এবারের ফিজিওথেরাপি দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল সুস্থ বার্ধক্য। তাই সুস্থভাবে বার্ধক্যে উপনীত হওয়া এবং বার্ধক্যে সুস্থ থাকা আমাদের মূল লক্ষ্য। তবে শুধু বার্ধক্য নয় সুস্বাস্থ্য হোক সবার জন্য। জনগণের দোরগোড়ায় আমরা পৌঁছে দেব চিকিৎসা সেবা। মনে রাখবেন চিকিৎসা সেবা আপনার অধিকার, মৌলিক অধিকার। কারো অনুগ্রহ নয়। ভালো থাকবেন সবাই।

ডা. নুসরাত জাহান সোনিয়া : ইনচার্জ এবং কনসালটেন্ট, ফিজিওথেরাপি বিভাগ, সিআরপি-মিরপুর, ঢাকা

‘জুলাই আর্ট ওয়ার্ক’-এর উদ্বোধন

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক সহযোগিতায় আগারগাঁও থেকে কারওয়ান বাজার মেট্রোরেল পিলারে অঙ্কিত গ্রাফিতি ‘জুলাই আর্ট ওয়ার্ক’-উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ১লা আগস্ট রাজধানীর আগারগাঁও মেট্রোরেল স্টেশনের নীচে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা বলেন, এই গ্রাফিতিগুলো আমাদেরকে আওয়ামী স্বৈরশাসনের ভয়াল দিনগুলো এবং জনগণের সাহসী প্রতিরোধের ইতিহাস বার বার স্মরণ করিয়ে দেবে। ভবিষ্যতে এ দেশে যেন আর কোনো স্বৈরাচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে, সে লক্ষ্যে এসব গ্রাফিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সভাপতির বক্তব্যে ডিএনসিসি প্রশাসক বলেন, ফ্যাসিবাদ ইস্যুতে জাতীয় ঐক্য ধরে রাখার বিষয়টি মাথায় রেখেই এই গ্রাফিতি কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। গত ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনের উত্থান এবং তার পতনের ইতিহাস তুলে ধরাই ছিল এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।

‘দেয়ালের ভাষা: স্মৃতি, প্রতিরোধ ও জনতার ইতিহাস’-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে অঙ্কিত জুলাই আর্ট ওয়ার্কে ২০২৪ সালের ঐতিহাসিক জুলাই ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান এবং ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধের এক শক্তিশালী চিত্রমালা উপস্থাপন করা হয়েছে।

দেয়ালচিত্রগুলোর মাধ্যমে ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক দমনপীড়নের ভয়াবহ অধ্যায় এবং ২০২৪ সালের ৩৬ দিনের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের নানা দৃশ্য–মিছিল, সংঘর্ষ, গ্রেপ্তার, আত্মত্যাগ উপস্থাপিত হয়েছে। গুম, হত্যা, ভোট ডাকাতি, শিক্ষাব্যবস্থার ধ্বংস ও নাগরিক অধিকারের হরণ–এসব বাস্তবতার প্রতিবিম্ব যেন ফুটে উঠেছে রং ও রেখার প্রতিটি আঁচড়ে।

ছাত্র-জনতা ও নাগরিক সমাজ নিজেদের শিল্পী, লেখক ও ইতিহাস-নির্মাতা হিসেবে প্রকাশ করেছে এই দেয়ালে। এটি কেবল গ্রাফিতির প্রদর্শনী নয়-একটি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নান্দনিক আন্দোলনের প্রামাণ্য দলিল।

প্রতিবেদন: কানিজ ফাতেমা

পর্যটন: সমৃদ্ধির সোপান

মাহবুবুর রহমান তুহিন

যখন ক্লাস টেনে পড়ি প্রথমবারের মতো কক্সবাজার গিয়েছিলাম। সেই কৈশোরে সাগরের নীল জলরাশির বিশাল সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়েছিলাম। সাগর আমাকে নেশার মতো টেনে ধরেছিল। আমিও গর্জনের ইন্দ্রজালে নিজেকে সমর্পণ করেছি। সেই মোহ এখনও কাটেনি। প্রথম পদ্যও তাই জলের ছলে লিখেছিলাম–

আমরা দু'জন খলখল জল
চপল প্রবল বন্যা।
প্রবাল সাগরে নীল জল আমি
তুমি জল কন্যা।

সে দিনের শেষ বিকাল সৈকত ধরে হেঁটে যেতে যেতে সামনে পড়ল 'হোটেল শৈবাল'। তখন এটি ছিল কক্সবাজারের বিলাসবহুল হোটেল। চোখ রাখতেই চোখে পড়ল 'পর্যটন বয়ে আনে আনন্দ সৃষ্টি করে বন্ধুত্ব'। পড়েই মনে ধরেছিল তাই এখনও মনে আছে। চলতি পথের যাত্রী আমি যেখানে গিয়েছি আনন্দে নেচে উঠেছি; অচেনাকে চিনে নিয়ে আত্মার আত্মীয় করেছি।

অজানাকে জানার, অদেখাকে দেখার কৌতূহল মানুষের চিরন্তন। এই অনন্ত পিপাসার পরিতৃপ্তিতে মানুষ ঘর থেকে বের হয়। আর তখনই চোখের আলোয় চোখের বাইরের পৃথিবী তার কাছে আসে। তাই আমরা বলতে পারি অনেক পথের ভ্রমণ একটি পা-ফেলার মাধ্যমেই শুরু হয়। তখন অতৃপ্ত মনের বাসনা–

থাকবো না কো বদ্ধ ঘরে দেখবো এবার জগৎটাকে,
কেমন করে ঘুরছে মানুষ
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।

দার্শনিক গুস্তাভ ফ্লুবেয়ার বলেন, 'ভ্রমণ মানুষকে বিনয়ী করে তোলে। সে জানতে পারে দুনিয়ার তুলনায় সে কত ক্ষুদ্র।' তাই একটি মানবিক পৃথিবীর প্রয়োজনেই ভ্রমণের আয়োজন করতে হয়। আমাদের প্রিয়নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.) বলেছেন, 'জ্ঞানার্জনের জন্য প্রয়োজনে চীন দেশেও যাও' এর মাধ্যমে মহানবী বৃত্ত ভেঙে বৃত্তের বাইরের পৃথিবীর সাথে পরিচিত হতে উৎসাহ দিয়েছেন। ভ্রমণ কর্কশকে মধুর করে, অসুন্দরকে সুন্দর করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন–

বিপুলা পৃথিবীর কতটুকু জানি, দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী।

এরপর শুধু এটুকু বলতে পারি, জানতে ও জানাতে পৃথিবীর পথে প্রান্তরে পরিভ্রমণের পসরা সাজাতে হবে।

বাংলাদেশ প্রকৃতির এক অনুপম লাবণ্যের নাম। নদী, বিল,

হাওর, পাহাড় আর সবুজ গ্রাম মিলিয়ে এ দেশের ভূখণ্ড যেন এক জীবন্ত কবিতা। ষড় ঋতুর আবাহনে কখনো সবুজের মখমল, কখনো সোনালি ফসল ক্ষেত, আবার কখনো বর্ষার টইটম্বুর স্রোত– প্রতিটি মুহূর্তেই প্রকৃতি এখানে নতুন করে রং বদলায়। কুয়াশায় মোড়া ভোর, রোদ ঝলমলে বিকাল আর তারার চিরচেনা রাত– সব মিলিয়ে বাংলাদেশ এক শান্ত, স্নিগ্ধ ও হৃদয়ছোঁয়া সৌন্দর্যের অবিচ্ছিন্ন নাম।

এখানে রমণীগুলো
নদীর মতো
নদী ও নারীর মতো কথা কয়,
এই মধুমতী, ধানসিঁড়ি নদীর তীরে,
নিজেকে হারিয়ে যেন পায় ফিরে ফিরে...

তাইতো এ সুন্দরের রূপসুধা পানে এখানে এসেছেন বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা, চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং, ভেনিসীয় অভিযাত্রী মার্কোপোলোরা। শৈশবে পড়েছি–

বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ংকর
জ্বালিল জ্ঞানের দ্বীপ তীব্বতে বাঙালি দীপংকর।

বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মাঝে গৌতম বুদ্ধের পর পূজিত হন তিনি। তাঁর জন্মস্থান মুন্সিগঞ্জের বজ্রযোগিনী গ্রামে। তাঁর বাসস্থান এখনও 'পণ্ডিত ভিটা' নামে পরিচিত। প্রাচীন বাংলায় পাল আমলে মুন্সিগঞ্জ তথা বিক্রমপুর অঞ্চলটি সারা বিশ্বের বৌদ্ধদের তীর্থকেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ বাংলাদেশের পাহাড়পুরে অবস্থান করেছিলেন এবং সেখানে বৌদ্ধ স্তুপ রয়েছে। ফলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে বাংলাদেশ অন্যতম একটি পবিত্র স্থান।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রবলভাবে বিকাশ লাভ করে খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে। এ সময় বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ ছাড়া বাকি অঞ্চল পাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় ১১ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল।

পর্যটনের অপার সম্ভাবনা হতে পারে ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়সহ প্রাচীন বুদ্ধিস্ট স্থাপনাগুলো। পার্বত্যাঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় থাকা শত শত বছরের পুরানো স্থাপত্যশৈলী ও নিদর্শনগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে। এজন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

বাংলাদেশের বৌদ্ধ স্থাপনাসমূহের ইতিবৃত্ত, ছবি, যাতায়াত ব্যবস্থা, আবাসিক সুবিধাসহ সামগ্রিক তথ্য বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের ওয়েবসাইটে থাকতে হবে। অনলাইনে বুকিং, হটলাইন নম্বরসহ তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করার অপশন ওয়েবসাইটে থাকতে হবে।

এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ প্রতিবছর ১০ লাখ বিদেশি পর্যটক পেতে পারে। এতে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা আরও ত্বরান্বিত হবে বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, এই পরিকল্পনা বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার ট্যুরিজম পরিচালনাকারীদের মধ্যে একটি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

মসলিন মুসলিম বাংলার ঐতিহ্য। ইরাকের বিখ্যাত ব্যবসাকেন্দ্র মসুলে পাওয়া যেত অতি সূক্ষ্ম কাপড়। মসুলের সূক্ষ্ম কাপড়তুল্য ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় তৈরি বাংলার ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র নাম-বিবর্তনের ধারায় হয় মসলিন। রাজকীয় পোশাক ঢাকাই মসলিন। ঠুট কার্পাস চড়কায় কেটে সর্বনিম্ন ৩০০ কাউন্টের সূতায় হাতে বোনা স্বচ্ছ ও অতি সূক্ষ্ম কাপড়।

মুসলিম বাংলার ঐতিহ্য মসলিনের আছে দীর্ঘ ইতিহাস। রোম সাম্রাজ্যের সোনালি অতীতেও রোমান নারীদের প্রিয় পোশাকের নাম ঢাকাই মসলিন। বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা সোনারগাঁয়ের বস্ত্রশিল্পের প্রশংসা করছেন। সম্রাট আকবরের সভাসদ আবুল ফজলও সোনারগাঁয়ের সূক্ষ্ম বস্ত্রের ভূয়সী করেছেন। পারস্যের কবি হাফিজ সোনারগাঁয়ের সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গজল রচনা করেন, সুলতানও কবিকে 'মসলিন' উপহার পাঠিয়ে সম্মানিত করেন।

মুসলিম বাংলার গর্ব মসলিন ১৭৫৭ সালে পলাশীর বিপর্যয়ের ধারায় হারিয়ে যায়। হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যের বর্ণনায় ইতিহাসবিদ আব্দুল করিম রচনা করেছেন 'ঢাকাই মসলিন' গ্রন্থ। জানা যায়, উনিশ শতকে তৈরি একটি মসলিন ১৮৫১ সালে বিলেতে প্রদর্শিত হয়েছিল। এক হাজার এক গজ এই মসলিনের ওজন ছিল আট তোলা। ঢাকা জাতীয় জাদুঘর সংরক্ষিত এক হাজার দুই গজ মসলিনের ওজন সাত তোলা। কথিত আছে, ৫০ মিটার দীর্ঘ একটি মসলিন অনায়াসে একটি দিয়াশলাই বাক্সে রাখা যেত। লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে প্রায় সাড়ে তিনশো ঢাকাই মসলিন শাড়ি সংরক্ষিত আছে।

আশার কথা, গবেষক ও তাঁতিদের নিবিড় প্রয়াস ও সরকারের আন্তরিক সহযোগিতায় মসলিনের পুনর্জন্ম হয়েছে। আমাদের এ ঐতিহ্য ও গৌরবের কথা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিতে হবে। তবেই দলে দলে পর্যটকরা এ দেশে আসতে লাইন ধরবে। এ জন্য একটি 'মসলিন পল্লি' বানানো সময়ের দাবি।

আমরা জানি, বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' যেটি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার থেকে ১৯০৭ সালে উদ্ধার করেন। তাঁর সম্পাদনায় ১৯১৬ সালে 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

খ্রিষ্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে রচিত এই গীতি পদাবলির রচয়িতারা ছিলেন সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ। বৌদ্ধ ধর্মের গূঢ় অর্থ সাংকেতিক রূপের আশ্রয়ে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেই তাঁরা পদগুলো রচনা করেছিলেন। বাংলা সাধন সংগীত শাখাটির সূত্রপাতও হয়েছিল এই চর্যাপদ থেকেই। সে বিবেচনায় এটি একটি ধর্মগ্রন্থজাতীয় রচনা। একইসঙ্গে

সমকালীন বাংলার সামাজিক ও প্রাকৃতিক চিত্রাবলি এই পদগুলোতে উজ্জ্বল। এর সাহিত্যগুণ এখনও চিত্তাকর্ষক। কবিগণ হলেন লুইপাদ, কাহ্নপাদ, ভুসুকুপাদ, শবরপাদ প্রমুখ। চর্যার একটি পদ:

নগর বাহিরে ডোম্বি তোহারি কুড়িয়া
ছোই ছোই যাসি ব্রাহ্মণ নাড়িয়া

আধুনিক বাংলা অর্থ হলো: যারা ডোম মানে সমাজের নীচু শ্রেণির মানুষ, তারা সাধারণত মূল নগরীতে স্থান পায় না, তারা শহরের উপকণ্ঠে বাস করে। কিন্তু তাদের সেই কুঁড়ে ঘরে ডোমদের মেয়েদের কাছে ব্রাহ্মণ; মানে সমাজের সবচেয়ে উঁচুতলার বাসিন্দা চুপে চুপে যায়। এটি বর্তমান সমাজেও এটি জারি আছে। তাই চর্যাপদের পদগুলোকে এখনও প্রাসঙ্গিক।

আমরা যদি বুদ্ধিস্ট সার্কিট দেশসমূহকে জানাতে পারি– ৩৫ কোটি মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, সে ভাষার উৎস তাদের ধর্মীয় বাণী সংবলিত অনুশাসনমাত্র এবং চর্যাপদকে চায়নাসহ আশপাশের দেশসমূহের ভাষায় অনুবাদ করে। দেশে একটি ভাষা জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করতে পারি। তবে এটিও পর্যটন আকর্ষণের অন্যতম উপায় হতে পারে।

ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম কাউন্সিল'র মতে (ডব্লিউটিসি) একজন ব্যক্তি কোনো স্থানে ২৪ ঘণ্টার বেশি অবস্থান করলে পর্যটক বলে বিবেচিত হবেন। আর একজন পর্যটক আসা মানে ৮টি সেক্টরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়া। কার্বন নিঃসরণে পৃথিবীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার এ সময়ে পর্যটন একমাত্র ধোঁয়াবিহীন শিল্প। আমরা যদি আমাদের পর্যটন সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারি তাহলে গার্মেন্টস ও রেমিট্যান্সের সাথে ট্যুরিজমকেও অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সেক্টর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব।

আমাদের প্রধান পর্যটন নগরী কক্সবাজার। এটিকে বহুমাত্রিক আকর্ষণ সমৃদ্ধ করে তোলার পদক্ষেপ হিসেবে এখনকার ৭৮ কিলোমিটার মেরিন ড্রাইভ সড়ককে বর্ধিত করে কুমিরা পর্যন্ত নিয়ে আসা যায়। পরবর্তীতে একে মিরেরসরাই, সোনাগাজী হয়ে নোয়াখালীর সুবর্ণচর পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত হয়েছে কক্সবাজার। এখানে রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে একে একটি ট্রানজিট বন্দরে রূপ দিতে হবে। পর্যটকদের জন্য একদিন বা দুদিনের প্যাকেজ অফার করতে হবে। আবাসিক হোটেলের মান বাড়াতে এবং রেট কমাতে হবে। খাবারের দাম কমাতে হবে। পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে মহেশখালীকে পর্যটন আকর্ষণ সমৃদ্ধ করতে হবে। সবরাং-এ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য পরিকল্পিত ক্যাম্পেইন এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ অফার ঘোষণা করতে হবে। কক্সবাজার-সুন্দরবন পর্যটক জাহাজ চালু করতে হবে। অন্যদিকে নোয়াখালীর সুবর্ণচর থেকে হাতিয়া-স্বর্ণদ্বীপ-ভাষানচর-নিঝুমদ্বীপে পর্যটক জাহাজ চালুর মাধ্যমে ট্যুরিস্টদের আকৃষ্ট করতে হবে। এসব স্থানে পর্যটন অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। সমুদ্রকন্যার কুয়াকাটার ভাঙন রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষকে ঘিরে রাজধানী ঢাকায় যে পরিমাণ জমায়েত হয় তা বিশ্বে সর্ববৃহৎ। বর্ষবরণে ঢাকা ও দেশের নগরসমূহ ছাড়াও ৫৬ হাজার বর্গমাইল জুড়ে এক উৎসব রচিত হয়, মেলা, শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমৃদ্ধ এ অনুষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশকে এক নতুন পরিচিতি দিয়েছে। আমরা যদি বর্ষবরণের এ প্রাণের উৎসবকে যথাযথভাবে ছড়িয়ে দিতে পারি এটি আমাদের পর্যটন বিকাশে এক নতুন মাত্রা যোগ করবে।

ভাষার জন্য রক্ত দেবার ইতিহাস বিশ্বে বিরল। আমরা সেই সে জাতি মায়ের ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের পূর্বসূরি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বাররা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে

দিয়েছে। সেই শহিদদের স্মরণে আমরা গেয়ে উঠি–

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি–

সীমানা পেরিয়ে একুশ এখন পৃথিবীর পাথেয়। একুশের আত্মত্যাগের প্রেক্ষাপটে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে মাতৃভাষাকে সমুন্নত রাখার প্রত্যয়ে জাতিসংঘের শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ক সংস্থা-ইউনেস্কো ১৭ই নভেম্বর ১৯৯৯ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণা করে। সেই থেকে পৃথিবীর প্রতিটি দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে ২১শে ফেব্রুয়ারি।

অমর একুশের স্মরণে ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা একাডেমি জুড়ে বসে বইমেলা; যা ইতোমধ্যে বাঙালির প্রাণের মেলায় রূপ নিয়েছে। একুশের ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত থেকে শহিদমিনারে শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে যে জনস্রোত বয়ে যায় এবং পরদিন বইমেলায় যে জনসমাগম হয় সেটি সত্যি অবাক করার বিষয়। আমরা যদি পৃথিবীর প্রতিটি প্রাঙ্গণে আমাদের আয়োজনের ব্যাপকতাকে ছড়িয়ে দিতে পারি তবে নিশ্চয়ই নানা প্রান্তের বাসিন্দারা এটি উপভোগ করতে হুমড়ি খেয়ে পড়বে; যা আমাদের পর্যটনকে দারুণভাবে বিকশিত করবে।

আমাদের ঈদ উৎসব, মহররম, দুর্গাপূজা, আমাদের নানা ধরনের সংগীত– জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা আমাদের জাতিসত্তাকে বিশেষ ঐতিহ্যমণ্ডিত করেছে। এর ঐতিহ্যের কথা বিশ্ববাসীকে জানান দিতে হবে। তাদেরকে আহ্বান করতে হবে যথাযথভাবে, তবেই তারা এ অনন্য জাতির বৈচিত্র্যময়তা দেখতে ভিড় জমাবে।

বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত ঢাকা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন নগরী। ঢাকার পুরানো ইতিহাস গৌরবময়। এক হিসাব জানা যায়, অষ্টাদশ শতকে পৃথিবীর সেরা শহরগুলোর মধ্যে একটি ছিল ঢাকা এবং সেরা শহরের ক্রমসংখ্যায় ঢাকার স্থান ছিল দ্বাদশতম। এ শহরকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে বাংলার এবং পরবর্তীকালের পূর্ববঙ্গের বা আজকের বাংলাদেশের ইতিহাস। শুধু তাই নয়, ঢাকাই বোধহয় একমাত্র শহর যেটি চারবার অর্জন করেছে রাজধানীর মর্যাদা। ঢাকার ইতিহাস, ঐতিহ্য, স্থাপত্য, নাগরিক জীবন, উৎসব, খাবারসহ ঢাকার গৌরব ছড়িয়ে দিতে হবে। ঢাকায় আসতে আহ্বান করেই বসে থাকলে চলবে না, পর্যটকদের স্বাচ্ছন্দ্যে ঢাকা দেখার জন্য পরিবহণ, গাইডসহ আনুষঙ্গিক আয়োজন সুচারুভাবে করতে পারার মধ্যে পর্যটনের আর একটি বিপুল সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে।

ইউনেস্কো ঘোষিত বাংলাদেশের বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন ও বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদসহ সুলতানি আমলে নির্মিত বিভিন্ন স্থাপনাসমৃদ্ধ পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে বিভিন্ন দেশে, জাদুঘর, লাইব্রেরি, তথ্য ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। এতে করে ভ্রমণপিপাসুরা এ অঞ্চলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবে এবং এখানে আসাতে উৎসাহী হবে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে রিভার ট্যুরিজম যেন এক অনাবিষ্কৃত কবিতার মতো– যার প্রতিটি পঙ্‌ক্তি স্রোতস্বিনী জলের বুকে লেখা। পদ্মা-মেঘনা-যমুনার বিস্তীর্ণ বুকে ভেসে চলা নৌযাত্রা, দুই তীরে ছড়িয়ে থাকা সবুজ গ্রাম, চরাঞ্চলের সরল জীবন আর সন্ধ্যার রাঙা আভা– এসব মিলিয়ে এক অনন্য সৌন্দর্যের আবহ সৃষ্টি করে, যা পর্যটকের হৃদয়ে স্থায়ী ছাপ ফেলতে সক্ষম। আধুনিক নৌপরিবহণ, নিরাপদ ক্রুজসেবা ও নদীকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক আয়োজনের সমন্বয় ঘটাতে পারলে বাংলাদেশ সহজেই বিশ্বমানের 'রিভার ট্যুরিজম'-এর এক আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত হতে পারে, যেখানে প্রকৃতি, ইতিহাস ও স্বল্পায়াস গ্রামীণ সৌন্দর্য এক হয়ে ভেসে বেড়ায় নীরব জলের বুকে।

বলা হয় 'প্রচারেই প্রসার'। আমাদের পর্যটন শিল্পের প্রসারে প্রচার অপরিহার্য। এ পৃথিবী যাতে বাংলাদেশকে চিনতে পারে সে জন্য বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য তুলে ধরে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রচারণা চালাতে হবে। দূতাবাসগুলোতে পর্যটন উইং স্থাপন করে পর্যটক টানতে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। দেশে একটি আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলার আয়োজন করতে হবে এবং এ মেলায় যাতে সর্বোচ্চ সংখ্যক দেশ অংশগ্রহণ করে সেটি নিশ্চিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও পর্যটন মন্ত্রণালয় নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে।

দেশের এয়ারলাইন্সগুলো যাত্রাপথে যাতে বাংলাদেশের পর্যটন সৌন্দর্য সংবলিত চিত্র প্রদর্শন করে সে উদ্যোগ নিতে হবে। সর্বোপরি একটি দেশের বিমানবন্দর হলো গেইটওয়ে। এটি একটি ঘরের ড্রয়িংরুমের মতো; যেটিকে আমরা সাজিয়ে-গুজিয়ে পরিপাটি করে রাখি; ঠিক তেমনি বিমানবন্দরকেও চমৎকার করে নান্দনিকভাবে সাজাতে হবে, যাত্রীসেবা হতে হবে আন্তরিক ও হয়রানিমুক্ত; যাতে করে একজন পর্যটক বা আগন্তুকের শুরুতেই দেশ সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা জন্ম নেয়। বিমানবন্দর থেকে শহরে আসা ঝামেলামুক্ত করতে পর্যাপ্ত পরিবহণের ব্যবস্থা করতে হবে। বিমানবন্দরে পর্যটককে সহায়তার জন্য পর্যটনকে ঢেলে সাজাতে হবে।

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশ; বাংলাদেশ। এর ঐতিহ্যের শেকড় গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে এর উৎসব, স্থাপত্য, ইতিহাস, সংগীত এবং ধর্মের মধ্যে। পর্যটনের কাঙ্ক্ষিত বিকাশে ঐতিহ্য অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে উঠতে পারে; কারণ এটি একদিকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধ তৈরি করে অন্যদিকে অর্থনৈতিক অগ্রগতিও সাধন করতে পারে। সময়ের পরিবর্তিত চাহিদানুযায়ী নান্দনিক বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ ট্যুরিজম ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আর এ ক্ষেত্রে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্যে পরিণত হতে বাংলাদেশের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

মাহবুবুর রহমান তুহিন: সিনিয়র তথ্য অফিসার, পিআইডি

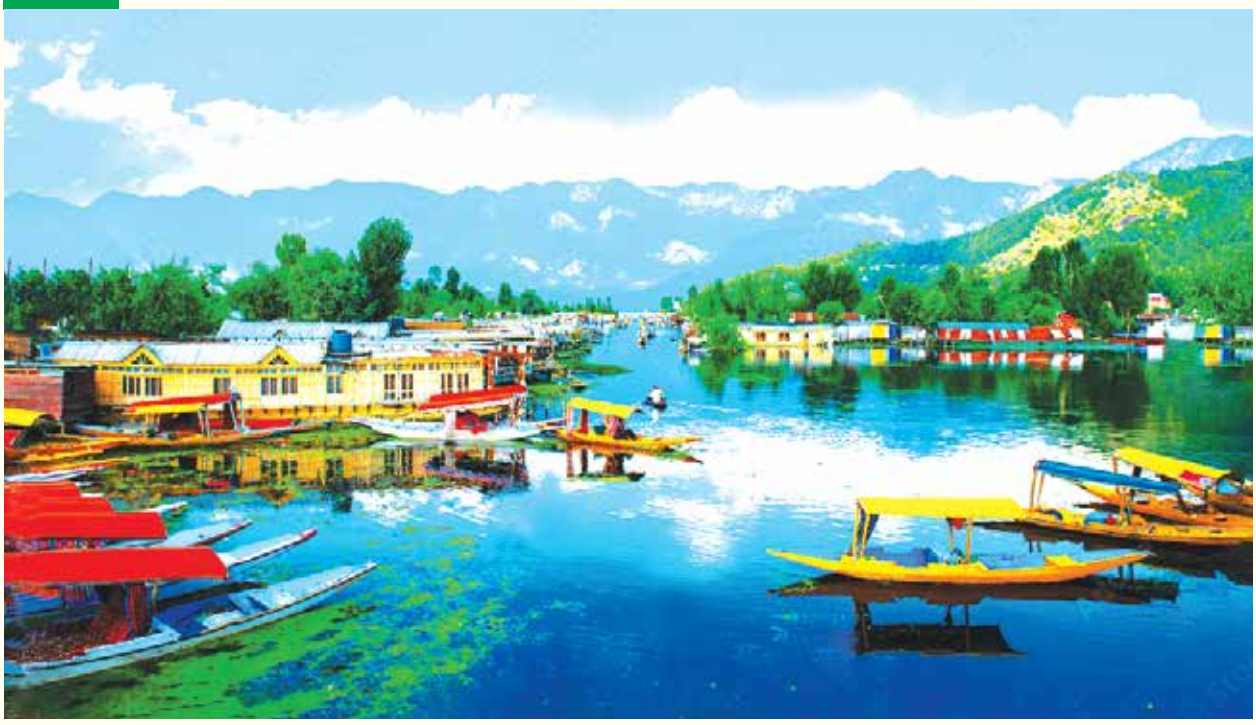

স্বর্গের জানালা খুলে যায় যেখানে-

আশফাকুজ্জামান

এক মহাপুরুষ ঘর ছেড়েছিলেন পূর্ণিমা রাতে। তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হয়েছিল এই জগৎ সংসার। আমরাও এক শীতের রাতে ঘর ছেড়েছিলাম। গন্তব্য কাশ্মীর। প্রায় আড়াই হাজার কিলোমিটার দূরের এক যাত্রা। ঢাকা থেকে আকাশপথে দিল্লি। তারপর এক অপরাহ্নে বিমান থেকে নেমে কাশ্মীরের ঘন কুয়াশায় ধূসর প্রকৃতিতে জীবনে প্রথম পা রাখা। প্রচণ্ড শীতে প্রায় জমে যাওয়ার অবস্থা। আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল গাড়ি। এত ঠান্ডায় বাইরে থাকার অভ্যাস নেই কারও। সবাই দ্রুত গাড়িতে উঠল। তারপর শিশিরভেজা আলো-আঁধারি সন্ধ্যায় কাশ্মীরের এক লেকের পাড়ে নামতে হলো। জীবনের কত সকাল-সন্ধ্যা গেছে তার হিসেব নেই। কিন্তু আজকের সন্ধ্যা মনে থাকবে চিরকাল। প্রায় শূন্য ডিগ্রি তাপমাত্রায় নীরব কোনো সন্ধ্যায় অচেনা কোথাও আছি। এমন সন্ধ্যা আসেনি কখনো।

ঠক, ঠক আনন্দ

প্রচণ্ড শীত নিয়ে রাত নেমে এসেছে চারদিকে। কেউ জানি না কেন একটি লেকের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি। আর কতক্ষণই বা থাকতে হবে। কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে প্রকৃতি। অল্প দূরের কিছুও দেখা যায় না। নিদারুণ শীতে সবাই ঠক ঠক করে আনন্দ করছি। কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ করতে হয়নি। কিছু সময়ের মধ্যেই দুটো নৌকা এল। নৌকার ছাদ আছে। বিভিন্ন রঙে সাজানো। এখানকার মানুষ নৌকাকে 'শিকারা' বলে। শিকারায় ভেসে একঘরে উপনীত হলাম। দেখতে একেবারে রাজপ্রাসাদের মতো। কিন্তু আসলে এটা এক ভাসমান নৌকা। অনেকটা আমাদের দেশের পানসি নৌকার মতো।

হাউসবোট

ভারতবর্ষে একসময় ইংরেজরা রাজত্ব করেছে। অবকাশ বিনোদনে তারা এই লেকে আসত। লেকের এ পানসি নৌকাকে বলত হাউসবোট। সেই থেকে এই নৌকা হাউসবোট নামে পরিচিত। শিকারা থেকে নেমে সুন্দর সিঁড়ি দিয়ে হাউসবোটে উঠতে হয়। উঠেই একটা সুন্দর খোলা জায়গা। বসার সোফা আছে। সেখানে ফায়ার প্লেস। চুল্লিতে আগুন জ্বলে। ফায়ার প্লেস ঘিরে সবাই জড় হলো। জীবনে তাপ-উত্তাপ কত জরুরি এই প্রথম অনুভব করছি।

দুঃখটা শুধু তারই রইল

আমাদের চিৎকার শুনে পাশের বোটের এক পরিবার এল। তারা এসেছে তামিলনাড়ু থেকে। তারা ঘরে-বাইরে দুজন ও এক কন্যা। মজা করে বললাম, ভাই সাহেব আপনাদের তো কোর্স কম্পিলিট হয়নি। আরেকটা সন্তান দরকার। সবাই হেসে উঠল। শুরু হলো তুমুল গল্প, আড্ডা। বাদ যায়নি হামাস-ইসরাইল, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ। বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের ধান্দাবাজি। ইউরোপের তাঁবেদারি। চীন, ভারত, রাশিয়ার পরাশক্তি হয়ে ওঠা। এমনকি বাংলাদেশের নির্বাচনও।

এভাবে কেটে গেল অনেক রাত। এদিকে ক্ষুধায় পেটের ধৈর্যের

সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ঐ পরিবারটিও চলে গেল। ডাইনিংয়ে খাবার প্রস্তুত। হুমায়ূন আহমেদের 'এই সব দিনরাত্রি' নাটকে দেখেছি একটা দৃশ্যে আনন্দ তো পরের দৃশ্যে দুঃখ। আসলে আনন্দ ও দুঃখ প্রায় একসঙ্গে ঘাপটি মেরে থাকে। যার যখন প্রয়োজন সে তখন সামনে আসে। এত উচ্ছ্বাসের মধ্যেও একটা দুঃখের ঘটনা ঘটল। হঠাৎ ফায়ার প্লেসের পাইপে ছোঁয়া লেগে একজনের হাত পুড়ে গেল। তারপর যা হওয়ার তার থেকে কম কিছু হয়নি। টলস্টয়ের *আনা কারেনিনা* উপন্যাসে ছিল, আনন্দ সবার। দুঃখগুলো যার যার মতো করে আলাদা। তাই যার হাত পুড়ে গেল দুঃখটা শুধু তারই রইল।

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেই ড্রয়িং-ডাইনিং। ডাইনিংয়ে খাবার দেওয়া হয়েছে। সবাই খেতে গেলাম। মেনুতে ছিল আলু রুটি, ভাত, মাংস, কোফতা, ডাল ও সালাদসহ আরও কিছু আইটেম। কাশ্মীরের রান্না অসাধারণ! একেবারে মায়ের হাতের রান্নার মতো।

হাউসবোটে অন্য পরিবারের সঙ্গে শেয়ারে থাকা যায়। আবার সম্পূর্ণ বোট ভাড়া নেওয়া যায়। ঐ যে কবিতায় আছে 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচতে চায়'। দলনেতা চান সবকিছুতে যেন স্বাধীনতা থাকে। অর্থাৎ খরচে অকৃপণ। তাই সম্পূর্ণ বোট ভাড়া নিয়েছেন।

সুইচ টিপলে গরম বিছানা

বেড রুমগুলোও স্বপ্নের মতো সাজানো। প্রতি রুমে সুন্দর পর্দা, ড্রেসিং টেবিল, ফ্লোরে কার্পেট, সুন্দর বিছানা। জীবনে প্রথম দেখলাম সুইচ টিপলে বিছানা গরম হয়। প্রতি বেডের সঙ্গে ইলেকট্রিক সুইচ আছে। সেটা টিপে দিলে বিছানা গরম হতে থাকে। বাথরুমে বাথটাব, ঠান্ডা-গরম পানি। হাউসবোটে কী আছে এর চেয়ে বড়ো প্রশ্ন কী নেই। এত সুন্দর মনে হবে যেন কল্পনার একটি ভাসমান বাড়ি।

অনেক রাতে ঘুমিয়ে অনেক সকালে ওঠা হলো না। কিন্তু ঘুম থেকে উঠেই বিস্ময়! গত সন্ধ্যায় বোঝা যায়নি কতটা বিস্ময় এখানে আছে। পানসি নৌকার মাথায় দাঁড়িয়ে অপার দৃশ্য দেখা যায়। সন্ধ্যায় একরকম তো সকালে অন্যরকম। যে-কোনো কঠিন মানুষও এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবে। যেদিকে তাকাই চোখ জুড়িয়ে যায়। লেকটা যে কত বড়ো রাতে সেটা বোঝা যায়নি। যত দূর চোখ যায় তার পরেও লেক ...।

দুপাশে সারি সারি অসংখ্য হাউসবোট। প্রতিটা বোটই নান্দনিক। নানা দেশ থেকে মানুষ ভ্রমণের জন্য এখানে এসেছে। রঙিন শিকারায় তারা হাউসবোটে যাচ্ছেন। লেকজুড়ে ভেসে বেড়ায় অসংখ্য শিকারা। শিকারায় ভেসে লেক দেখা এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। মনে হবে এ যেন এক স্বপ্নের জগৎ। আমাদের এখানো শিকারায় ভেসে এই সৌন্দর্য অবলোকেনের সুযোগ হয়নি।

আমাদের দলনেতা একদিন আগেই দুটো শিকারা ঠিক করে রেখেছেন যেন পুরো লেক ঘুরে এর ঐশ্বর্য উপভোগ করা যায়। এই লেক শুধু তার সৌন্দর্যের জন্যই বিখ্যাত নয়। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের পর্যটক ও স্থানীয়দের এক অপরূপ মিলনমেলা। অনেকে এই লেককে প্রাচ্যের ভেনিস বলে।

শিকারায় ভাসতে ভাসতে দেখা যায় মেঘ, পাহাড় ও রোদের খেলা। অনন্য বৈচিত্র্যে ভরা এর প্রকৃতি।

রূপকথার রাজকন্যা

লেক ঘিরে হাজারো মানুষের জীবিকা। কেউ হাউসবোটের মালিক, কারও শিকারায় পর্যটকেরা ঘুরে বেড়ায়। কেউ বিক্রির জন্য বিভিন্ন পণ্যের পসরা সাজিয়ে শিকারায় ভেসে বেড়ায়। এসব পণ্যের মধ্যে যেমন রয়েছে আংটি, চুড়ি, হার, শাল, হাতের তৈরি লেদার-কাপড়ের ব্যাগ, গয়নার বাক্সসহ অনেক উপকরণ তেমনি খাদ্য পণ্যের মধ্যে রয়েছে আখরোট, বাদাম, ভুট্টা, ফলমূল, মধু বারবিকিউসহ আরও অনেক খাবার।

এই ঐতিহাসিক লেকের নাম 'ডাল লেক'। এটা কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের এক বিশাল হ্রদ। কাশ্মীরকে বলা হয় রূপকথার রাজকন্যা। এই লেক হলো রাজকন্যার হৃদয়। লেকের দক্ষিণ ও পূর্বে রয়েছে আকাশ ছোঁয়া পর্বতমালা। সকালের স্নিগ্ধ রোদে চকচক করে বরফে ঢাকা পর্বতের চূড়া। উত্তরে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শালিমার ও নিশাত উদ্যান। আর পশ্চিমে হজরত বাল মসজিদ।

শ্রীনগর এক সময় মুঘলদের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ছিল। তাঁরা একে ফুলের বাগানসহ নানা উপকরণে সাজিয়েছে। খ্রিষ্টের জন্মের প্রায় ৩০০ বছর আগে এই নগরের পত্তন হয়েছিল বলে ধারণা। আর 'ডাল লেক' ছিল এর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। এর সাথে বন্ধুত্ব ঝিলম নদীর। দূর থেকে এই নদী ছুটে এসেছে বন্ধুর সঙ্গে মিলনের জন্য।

কাশ্মীরে ঘুরতে এসে এই লেক দেখে না এমন পর্যটক প্রায় নেই। এখানে সাধারণত চারটি ঋতু। প্রতি ঋতুতে লেক নতুন রূপে

সাজে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে সাত কিলোমিটার। সাড়ে তিন কিলোমিটার পর্যন্ত প্রশস্ত ও ২০ ফিট পর্যন্ত গভীরতা আছে। আয়তন প্রায় ২৬ বর্গকিলোমিটার। ফ্রেমে বাধাই করার মতো সৌন্দর্য এই লেকের।

পেহেলগাম

এই দলের থাকা, খাওয়া, যাতায়াত সবই রাজকীয়। ডাল লেকের ঐশ্বর্য উপভোগের সময় ছিল এক সন্ধ্যা, এক রাত, এক দুপুর। প্রায় ২০ ঘণ্টা।

এবার গন্তব্য কাশ্মীরের নদী ও উপত্যকাশোভিত আরেক জনপদ। এর নাম পেহেলগাম। ডাল লেক থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে গেলে পেহেলগাম। পথে পথে নানা বৈচিত্র্য।

চারপাশের দৃশ্য ভীষণভাবে মুগ্ধ করে। কখনো ফসলের মাঠ, জাফরান খেত, কোথাও আখরোট ও আপেল বাগান। আবার কখনো পাহাড়ের গা ঘেঁষে ঝরনার সাথে পথ চলা। কলকল ধ্বনিতে ঝরনার পানি এমনভাবে বয়ে যায় যেন তানপুরার এক মায়াবী সুর। দূরে বরফে ঢাকা পর্বতমালা আর সবুজ প্রান্তর। রাস্তার দুপাশে খাবার, ফলমূল, নান্দনিক গহনা ও ঐতিহ্যবাহী শালের দোকান তো আছেই। চলার পথটাও যে কত সুন্দর সেটা বোঝানো যাবে না।

নিউ হ্যাভেন

চলতে চলতে গাড়ি থামে এক পাহাড়ের গাঁয়ে। তখন গোধূলি। পেহেলগামে একটু দেরিতে সন্ধ্যা নামে। ছবির মতো সুন্দর পেহেলগাম। পাহাড়, পাইন ট্রি, নদী আর বরফের অপূর্ব গ্রাম। যেন স্বপ্নের তুলি দিয়ে আঁকা উপত্যকা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭ হাজার ফুট উঁচুতে। দূরের নীল আকাশকে মনে হয় ছোঁয়া যাবে। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। চারদিকে রাত নেমে এসেছে।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে নিউ হ্যাভেন হোটেল। রাস্তা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলে ছোটো ল্যান্ডিং। ল্যান্ডিং থেকে গেট দিয়ে হোটেলে ঢুকে দুই তলায় আমাদের তিনটা রুম। কথা ছিল দ্রুত শুয়ে পড়া। কিন্তু দলনেতা বলেন সবকিছু কথা মতো হয় না। সত্যি সত্যি হলো না। শুতে শুতে অনেক রাত হলো। সকালে রুমের জানালা খুলতেই এমন এক দৃশ্য দেখা গেল যা বাস্তবে কেন স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না। জানালা খুলতেই দেখি রুমের খুব কাছে সাদা বরফে ঢাকা বিশাল উঁচু পাহাড় চূড়া। সকালের মিষ্টি রোদে সেটা এমন অপরূপ লাগছে যে দলনেতার মতো কঠিন মানুষকেও বিস্মিত করবে। ঘুম থেকে উঠে এমন একটি নান্দনিক দৃশ্য দেখার আনন্দই আলাদা। পরে খেয়াল হলো আমাদের প্রতিটি রুম থেকেই এমন অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। এখানের হোটেলগুলো এমন পরিকল্পনা থেকেই করা হয়েছে। দলনেতাকে ধন্যবাদ যে তিনি এমন একটি হোটেল ঠিক করেছিলেন।

সুইজারল্যান্ড

রাতেই ঠিক হয়েছিল যে সকালে নাশতার পর সুইজারল্যান্ড যেতে হবে। সবার মধ্যে এক অন্যরকম উত্তেজনা। এ এক অদ্ভুত সুইজারল্যান্ড। যেখানে যেতে পাসপোর্ট লাগে না। ভিসা লাগে না। বিমানে উঠতে হয় না। একমাত্র বাহন ঘোড়া। আবার হেঁটেও যাওয়া যায়। যাওয়া-আসা প্রায় ১৫ কিলোমিটার। প্রতি ঘোড়ার ভাড়া ১ হাজার থেকে ১৫শ রুপি। আমাদের সাতটা ঘোড়া প্রয়োজন। 'কথায় আছে ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দা হাঁটিয়া চলিল।' আমরা ঘোড়ায় চড়িয়া হাঁটিয়া চলিলাম না। ঘোড়ায় চলিলাম। আমাদের দলে শিশু, কিশোর, নারী, সিনিয়র সিটিজেনসহ বিভিন্ন ব্রান্ডের সদস্য আছে। সবাই ঘোড়ায় চড়তে ভয় পাচ্ছে। কিন্তু সবার মধ্যে চড়ার উত্তেজনা আছে। কেউ এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে চায় না। ভয়, আনন্দ, উত্তেজনা একই সঙ্গে কাজ করছে।

ঘোড়ার পিঠে ওঠার সময় কিছুটা বুক দুরুদুরু করে। কিন্তু একবার ঠিকভাবে বসতে পারলে আর সমস্যা নেই। বসার জন্য ঘোড়ার নীল দাঁড়ার ওপর আরামদায়ক করার কোনো ঘাটতি নেই। সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণ করে সবাই ঘোড়ার পিঠে উঠল। প্রথমে কিছুটা ভয় পেলেও একটু পরে সবাইকে পেশাদার ঘোড়া সওয়ার মনে হলো। যাত্রা পথের একটা অংশ কার্পেটিং, তারপর মাটি আর পাথর, এরপর শুধু পাথর আর পাথর। প্রত্যেকের ঘোড়ার নাম আছে। আমার ঘোড়া-বুলবুল, দলনেতার ঘোড়া-পাঠান, গালিবের-দুলদুল, অয়নের-পঙ্খীরাজ, মেঘলার ঘোড়ার নাম-শাহজাদি। তন্দ্রার ঘোড়ার নাম- রাজা, আহিলের-সুলতান। ঘোড়ার পিঠে চড়ে কীসের বাংলা, কীসের হিন্দি, দলনেতার মধ্যে হলিউড সিনেমার নায়কের ভাব এসে গেল।

এক স্বপ্নপুরি

শুরুতে পাকা রাস্তা দিয়ে ঘোড়া হাঁটছে। ঠক-ঠক-ঠক-ঠক করে বাজনার মতো শব্দ হচ্ছে। মনে পড়ে গেল পরিচিত সিনেমার সেই দৃশ্যের কথা যেখানে নায়ক দস্যুদের কাছ থেকে নায়িকাকে উদ্ধার করে ঘোড়ার পিঠে নিয়ে ছুটে যায়। দ্রুত ছুটতে ছুটতে

এক সময় ঘোড়া অদৃশ্য হয়ে যায়। শুধু তো দলনেতার সাত ঘোড়া না, অসংখ্য ভ্রমণপিপাসুর ঘোড়া সুইজারল্যান্ড যাচ্ছে। এক সাথে এত ঘোড়ার ঠক-ঠক শব্দ কোনোদিন শোনা হয়নি। সবাই ভীষণ পুলকিত, শিহরিত। কোনো কোনো জায়গায় পাহাড় থেকে ঝরনা নেমে এসেছে। ক্লান্ত ঘোড়া সে ঝরনার পানি পান করছে। আবার কোথাও পানি জমে বরফ হয়ে গেছে।

বিশাল উঁচু পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে ঘোড়া হাঁটছে। চিরদিন মনে রাখার মতো সব স্মৃতি জমা হচ্ছে। যেতে যেতে কাশ্মীরের পুরানো গ্রাম দেখা যায়। দেখা যায় পাহাড়ের দীর্ঘ উপত্যকা। অদূরে পাহাড়ের চূড়ায় জমে থাকা বরফ। বরফের ওপর গাড়িয়ে পড়ে সকাল, দুপুর ও বিকালের মিষ্টি রোধ। পাহাড়ের মাটি ফুঁড়ে আকাশের দিকে উঠে গেছে সারি সারি পাইন ট্রি। মনে হয় এ যেন এক স্বপ্নপুরি।

সবুজ গালিচা

একজন মানুষ যত সুন্দর কল্পনা করতে পারে সুইজারল্যান্ড যেতে চারপাশের দৃশ্য এর থেকেও বেশি সুন্দর। আমাদের ঘোড়ারা পাকা রাস্তা, মাটি ও পাথরের রাস্তা পেরিয়ে এখন শুধু পাথার ও পাইনি ট্রির ভেতর দিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠছে। কোথায় কোথায় এত খাড়া যেন ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার অবস্থা। সদস্যদের অনেকে ভয়ে চিৎকার করছে। কোনো উপায় নেই। উপায় একটাই মনে সাহস নিয়ে শক্ত হয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা। কোনো সন্দেহ নেই খুব যত্নের সঙ্গে সবাই সেটা করছে। এমন নানা চড়াই-উতরাই পার হয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা হর্স রাইডের পর এক সময় সুইজারল্যান্ড এলাম।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় সাড়ে সাত হাজার ফুট ওপরে এই সুইজারল্যান্ড। উঁচু পাহাড়ের ওপর কয়েকটা ফুটবল মাঠের মতো বিশাল ফাঁকা সমতল ভূমি। সমস্ত জায়গাজুড়ে যেন ঘন ঘাসের চাদর। যেন এক দীর্ঘ সবুজ গালিচা। এত উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে আকাশ দেখা দূরের পাহাড় দেখা, পাহাড়ের চূড়ায় সাদা বরফ জমে থাকতে দেখা, বিকালের স্নিগ্ধ আলোয় আরও সুন্দর হয়ে ওঠে এই সুইজারল্যান্ডের প্রকৃতি। এখানে হিন্দি ছবির শুটিং হয়। অনেকে একে শুটিং স্পটও বলে। এমন দৃশ্য দেখতে পাওয়া অনেক বড়ো ব্যাপার। মনে পড়ে যায় ছোটোবেলায় শোনা গানের কথা, 'হায়রে আমার মন মাতানো দেশ...রূপ দেখে তোর কেন আমার নয়ন ভরে না'। আসলেই তাই এই সুইজারল্যান্ড যত দেখি পরান জুড়াবে না।

মিনি সুইজারল্যান্ড

এতক্ষণ যে সুইজারল্যান্ড কথা বলা হলো, সেটা আসলে পেহেলগামের একটি সুন্দর দর্শন জায়গা। এ জায়গাটির স্থানীয় নাম বাইসারন। পাহাড়ের ওপরে এই সমতল ভূমি। পুরোটাই সবুজ ঘাসের চাদর। আকাশছোঁয়া পাইন-ট্রি। দূরে পাহাড়ের ওপর জমে থাকা বরফ সব মিলে এ জায়গার এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য আছে। একমাত্র সুইজারল্যান্ডে নাকি এমন দৃশ্য দেখা যায়। অপূর্ব সৌন্দর্যের জন্য জায়গাটির নাম মিনি সুইজারল্যান্ড। পেহেলগামে কয়েকটি অসাধারণ দর্শনীয় জায়গা রয়েছে। এরই একটি হলো মিনি সুইজারল্যান্ড।

কাশ্মীরি ভাষায় নাগ মানে ঝরনা। আর অনন্ত মানে অনেক। পেহেলগাম হলো কাশ্মীরের অনন্ত নাগ জেলার একটি সুন্দর জায়গা। এখানে একের পর এক মুগ্ধ হওয়ার মতো ঝরনা দেখা যায়। পেহেলগামের অনেক কিছু দেখা হলো আবার অনেক কিছু দেখা হলো না। জীবনানন্দ দাসের কবিতার মতো, সব পাখি ঘরে আসে– সব নদী ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন...। তাই এক সময় ঘরে ফিরতে হয়। জীবনের লেনদেন শেষ হয়। মিনি সুইজারল্যান্ড থেকে ফিরতে ফিরতে প্রায় বিকাল হলো। তাড়াতাড়ি লাগেজ গুছিয়ে গাড়িতে আবার কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের পথে।

গুলমার্গ

এবার গন্তব্য কাশ্মীরের আরেক বৈচিত্র্যময় জনপদ। এই জনপদের নাম 'গুলমার্গ'। গুলমার্গের এক পৌরাণিক ইতিহাস আছে। পুরানো কাহিনি মতে হিমালয়ের কন্যা পার্বতী। পার্বতীর আরেক নাম গৌরী। তিনি কাশ্মীরের এই পথ দিয়ে যেতেন। তাই প্রাচীনকালে এর নাম ছিল গৌরী মার্গ। অর্থাৎ গৌরী দেবী যে পথ দিয়ে যান।

পরবর্তীতে রাজা ইউসুফ শাহ এর নাম রাখেন গুলমার্গ বা গোলাপের স্থান। শ্রীনগর থেকে এঁকেবেঁকে প্রায় ৫২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে গেলে এই গুলমার্গ। চলতে চলতে গাড়ি চালক শাকিল ভাই বললেন, 'গুলমার্গ হলো কাশ্মীরের এক অনিন্দ্য সুন্দর উপত্যকা। এর কিছু দূরেই পাকিস্তান সীমান্ত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৯ হাজার ফুট ওপরে। এর রূপের যেন শেষ নেই'।

এঁকেবেঁকে সাপের মতো গাড়ি চলছে। একবার বাঁকা রাস্তা দিয়ে পাহাড়ের ওপরে যাচ্ছে আবার নেমে আসছে। কখনো কখনো অনেক পথ চলার পরও গাড়ি প্রায় একই জায়গায় থাকছে। পাহাড়ের উপত্যকার ভাজে ভাজে বরফ জমে আছে। কোথাও কোথাও রাস্তার ওপরও বরফ জমা হয়েছে। অনেক উঁচু পাহাড়ের ঢাল দিয়ে রাস্তা।

বরফ কন্যা

এখনে প্রায় সারাবছর শীত। তার ওপর এখন শীতকাল। চারদিকে প্রচণ্ড শীত। এ সময় গুলমার্গকে মনে হয় বরফ কন্যা। শুভ্র বরফ, দৃষ্টিনন্দন পর্বত, উপত্যকা, উদ্যান, পাহাড় চূড়ায় রোদের খেলা, কুয়াশায় ঢাকা স্নিগ্ধ হ্রদ। সবকিছু যেন শিল্পীর আঁকা চিত্রকল্প। সেটা হোক না কোনো রোদেলা দুপুর বা ধূসর কোনো নীরব বিকাল। সব সময় এর এক অকল্পনীয় সৌন্দর্য। এসব ঘিরে অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে দীর্ঘ সবুজ পাইন ট্রি। এ এক অন্যরকম জগৎ। যেন কোনো জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় অপরূপ সুন্দর হয়েছে।

এক সময় পাহাড়ের কোলে গাড়ি থামল। এখানেই বরফ দেখা যায়। স্থানীয়রা দলনেতাকে বলল– লোকাল গাড়িতে আরও কিছুটা দূরে গেলে বিস্তীর্ণ ভূমিতে বরফ জমে থাকতে দেখা যাবে। লোকাল গাড়িতে তিনি সদস্যদের নিয়ে সেখানে গেলেন। সত্যি এখানে বিস্তীর্ণ সমতল জায়গাজুড়ে বরফ জমে আছে। সাদা বরফের ওপর দৌড়াদৌড়ি, গড়াগড়ি, স্কেটিং, লাফঝাঁপ, চিৎকার চেঁচামেচি কত কিছু যে করা হচ্ছে এর যেন শেষ নেই। সবাই খুশিতে আত্মহারা।

এখানে বরফের পাহাড় যেন ওপরের দিকে আকাশের সাথে মিশেছে। মনে হবে যেন আকাশ থেকে নেমে আসছে সাদা বরফের নহর। সেই বরফে ঢেকে যাচ্ছে বিস্তীর্ণ ভূমি। সৃষ্টিকর্তার এমন অপার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে কখনো চোখে জলও আসতে পারে।

এই টিমের সবার জন্য এমন জায়গায় আসা, এমন দৃশ্য দেখা এই প্রথম। এখানে সারাদিন থকাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ঐ যে দলনেতা বলেছেন সব ইচ্ছে পূরণ হয় না। লোকাল গাড়িতে যেখান থেকে এসেছিলাম আবার সেখানে ফিরে এলাম।

অপূর্ণতা রইল না

এখানে এসে আবার পেয়ে গেলাম অষ্টম আশ্চর্য। এ কয়দিন শুধু দূর থেকে বরফে ঢাকা পাহাড় দেখেছি। বার বার মনে হয়েছে যদি কোনোদিন ঐ পাহাড়ে উঠতে পারতাম। এবার আমরা সত্যি সত্যি এমন একটা বরফের পাহাড় পেয়ে গেলাম। যে পাহাড়ে ওঠা যায়। সবাই ক্লান্ত ছিলাম তারপরও অনেক ঝুঁকি নিয়ে বরফের পাহাড়ে উঠলাম। জীবনে আর কোনো অপূর্ণতা রইল না।

রোপ ওয়ে

এখানে রুপি দিয়ে রোপ ওয়েতে ওঠা যায় স্কেটিং করা যায়।। রোপ ওয়ের স্থানীয় নাম 'গন্ডোলা'। এটা নাকি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ক্যাবল কারের একটি। অনেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্যাবল কার বলে। আমাদের অবশ্য রোপ ওয়েতে ওঠা হয়নি। এর টিকিটের মূল্য বেশি। তারপরও পাওয়া যায় না। কয়েকদিন আগে টিকিট করতে হয়। আমরা রোপ ওয়ের খুব কাছে ছিলাম। এসব বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। যদি ওঠার কোনো সুযোগ থাকে।

এখানে কংডুরি নামে একটি পর্বত আছে। রোপ ওয়েতে এক ঘণ্টায় সেখানে যাওয়া যায়। সেখান থেকে গুলমার্গের পুরো ল্যান্ডস্কেপ দেখা যায়। পর্যটকের কাছে এটি নাকি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। শুনেছি এখানে আফারাওয়াত শিখর নামে একটি জায়গা আছে। এটি নাকি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৩ হাজার ফুটেরও বেশি উচ্চতায়। এ জায়গাটি গুলমার্গের এত সুন্দরের মধ্যে আরও সুন্দর। এখানে প্রায় সবসময় তুষারপাত হয়। এর শিখর থেকে উপত্যকার আরও নান্দনিক দৃশ্য দেখা যায়। এর মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরেই আবার পাকিস্তান সীমান্ত। গুলমার্গের আরেকটি রূপকথার মতো জায়গা হলো খিলন মার্গ। কারও যদি এই গ্রহের সুন্দর কোনো জায়গায় যেতে ইচ্ছে করে তাহলে নাকি খিলন মার্গা হতে পারে সেই জায়গা। মনে হবে সৃষ্টিকর্তা নিজ হাতে সবকিছু সাজিয়ে রেখেছে।

স্নোফল

এখানে আসার ভালো সময় হলো মার্চ থেকে নভেম্বর। তবে এপ্রিল-মে'তে এখানকার প্রকৃতি

বেশি সুন্দর হয়। কিন্তু যারা স্নোফল দেখতে চায় তাঁদের যেতে হবে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে। আবার এ সময়ের মধ্যে এলেই যে স্নোফল দেখা যাবে সেটাও নিশ্চিত না। এই সময়ের মধ্যে যাওয়ার পরও এই লেখক স্নোফল দেখতে পাননি। আপনি হয়ত বড়ো জোর পাঁচ থেকে সাত দিন থাকবেন। সে সময়ের মধ্যে স্নোফল নাও হতে পারে। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে শুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা থাকবে বিশাল এলাকা। তবে যারা কঠিন ঠান্ডা পছন্দ করেন তাদের কাছে ডিসেম্বর-জানুয়ারি হবে সবচেয়ে প্রিয় সময়। মুঘল ও ব্রিটিশ শাসকদের অবকাশের প্রিয় জায়গা ছিল গুলমার্গ।

পাহাড় ও বরফের এক নিঃশব্দ মায়া সোনমার্গ

গুলমার্গের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে প্রায় ঘনিয়ে এলো সন্ধ্যা। হোটেলে ফিরতে হলো বেশ রাত। পরের দিনের যাত্রা সোনার তৃণভূমি। এখানে এক সোনালি জলের কূপ থাকার কথা প্রচলিত আছে। যে কারণে এ জায়গার নাম হয় সোনমার্গ। রাজধানী শ্রীনগর থেকে প্রায় ৮৭ কি.মি. উত্তর-পূর্বে এই সোনমার্গ।

এই দপ্তরে পাহাড়ে পাহাড়ে বৈষম্য, পাহাড়ের প্রতি মানুষের অত্যাচার, পৃথিবীতে তাদের টিকে থাকার অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে কি না সব যেন এখান থেকে নিশ্চিত হয়। জীবনে এত পাহাড় এক জায়গায় কখনো দেখা হয়নি। আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আছে যেন ঘোমটা পরা লজ্জাবনত পর্বতমালা। কাশ্মীর ভ্রমণে এ পর্যন্ত অনেক পাহাড় দেখা হলো। কিন্তু সোনমার্গের এক একটি পাহাড় যেন একেকটি মায়া।

শুধু পথের টানেই

বরফ ও পাহাড়ের দিক থেকে গুলমার্গ ও সোনমার্গ প্রায় একই রকম। তবে অন্য বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ভূস্বর্গের সেরা আকর্ষণ সোনমার্গ। শ্রীনগর থেকে কারগিল হয়ে সোজা রাস্তা গেছে লাদাখের পথে। চলার সময় দেখা যাবে পাহাড়ের স্বর্ণ চূড়া। সিন্ধু নদীর স্রোত। তবে এটা ছোটো বেলায় বইয়ে পড়া সেই সিন্ধু নদ না। সোনমার্গের একটি পাহাড়ি অপূর্ব নদীর নাম সিন্ধু। এর সৌন্দর্য আত্মহারা করে দেয়। শুধু পথের টানেই সোনমার্গ যাওয়া যেতে পারে। পুরো পথটাই আকর্ষণীয়। চোখ ফেরানো কঠিন। রাস্তার দুপাশে কাঠবাদাম ও চেরি গাছের সারি যে কাউকে আপন করে নেবে।

এক সময় পৌঁছে গেলাম সোনমার্গ। সোনমার্গও জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। এটি একটি দীর্ঘ উপত্যকা। এর পাহাড়ি ঢালে রয়েছে কাশ্মীরের গ্রাম। গাড়ি থামল পাহাড়ে ঘেরা এক সবুজ ঢেউ খেলানো উপত্যকায়। এখানে সুন্দর হিমবাহ আছে। সেখানে ঘোড়ায় চড়ে ও হেঁটে যাওয়া যায়। হিমবাহের পাশে আছে শুকনা জায়গা। এটা হলো মানুষ ঘোড়ার ল্যান্ডিং। পর্যটকেরা ঘোড়ায় চড়ে এখানে নামে। এখানে ফায়ার প্লেস আছে। ঠান্ডায় হাত-পা জমে গেলে আগুনের পাশে বসা যায়। নানা প্রজাতির বাদাম ও মসলা দিয়ে বানানো 'কাওয়া' নামে এক ঐতিহ্যবাহী চাসহ নানা খাবার রয়েছে।

এটি এক দুর্দান্ত ল্যান্ডস্কেপ। ফটোগ্রাফারদের স্বর্গরাজ্য। আসলে ভূ-স্বর্গ তো স্বর্গই। দূরে কিছু পর্বত ধূসর, কিছু সবুজ, কিছু তুষারাবৃত। এখানে বরফে মোড়া পাহাড় চূড়ার রূপ সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। এখানেও পর্যটকেরা সাদা গালিচার মতো বরফের আনন্দ নিতে পারে। তুষারময় পাহাড়ের পেছনে থাকে নীলাকাশ। এ এক সীমাহীন আনন্দ। মনে হয় যেন জীবনে আর কিছু চাওয়ার নেই। সোনমার্গের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। এক সময় এটা সিল্ক রোডের প্রবেশদ্বার ছিল। এই সিল্ক রোড কাশ্মীরকে চীনসহ উপসাগরীয় দেশের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। 'আগার ফেরদৌস বে-রোহী যামীন আস্ত, হামীন আস্ত, হামীন আস্ত, হামীন আস্ত' অর্থাৎ পৃথিবীতে যদি কোনো বেহেশত থাকে, তবে তা এখানে, এখানে, এখানে। ফার্সি ভাষায় এ কথাটি বলেছিলেন মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীর। কাশ্মীরকে তিনিই প্রথম স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

আশফাকুজ্জামান: লেখক, সংগঠক ও সাংবাদিক

নতুন পর্যটন সম্ভাবনা চর ট্যুরিজম

মো. আবদুল কাদের

রূপ ঐশ্বর্য আর সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশ। প্রাকৃতিকভাবে এত সুন্দর দেশ আর পৃথিবীর কোথাও নেই। এর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সৌন্দর্য। আর তাই আমরা এমন সুন্দর ভূমিকে বেহেশতের সঙ্গেও তুলনা করি অনেক সময়। কবি-সাহিত্যিকরা যে কত উপমায় এ দেশকে বর্ণনা করেছেন তার শেষ নেই। একটা দেশ এগিয়ে যায় সে দেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে। আমাদের রয়েছে ঐতিহ্যের বিশাল ভাণ্ডার! আর তাই তো মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখেছেন–

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন!

ভ্রমণ করতে সবাই ভালোবাসে। দেশের ভেতর সেই ভ্রমণ হলে কথাই নেই। দেশ দেখাও হবে। দেশের টাকাও দেশে থাকবে। তাছাড়া নিজের দেশ ভ্রমণ না করে বিদেশ ভ্রমণের মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই। নিজের দেশ বা আশপাশে ভ্রমণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসংখ্য কবিতা, গান ও লেখা আছে। এর মধ্যে অন্যতম দেশপ্রেমের কবিতা হলো–

বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

এর মানে আমরা অনেক দেশ ভ্রমণ করলেও দেশের মধ্যেই যে কত সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে তা দেখি না। ধানের শিষের ওপর যে বিন্দু আছে সেদিকে খেয়াল করি না। অথচ বাংলাদেশের যে অঞ্চলেই যাই না কেন সেখানেই রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। তবে এসব ঐতিহ্যকে পুঁজি করে ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছে সংস্কৃতির আকর! সেই সাথে এসেছে ট্যুরিজমে নতুনত্ব।

বাংলাদেশের মানুষ এখন অনেক ভ্রমণপ্রিয়! সময় পেলেই দেশে-বিদেশে ঘুরতে যায়। একটা সময় দেশের বাইরে ঘুরতে যেতে চাইতেন। এরপর ভ্রমণের স্পট হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেল কক্সবাজার। তারপর একে একে সুন্দরবন, কুয়াকাটা, জাফলং, সেন্টমার্টিন, নীলগিরি, নাফাখুম, সাজেক– এমন অসংখ্য নাম। একই সাথে মানুষের মাঝে আগ্রহ তৈরি হলো বিভিন্ন প্রত্নতত্ত্ব দর্শনীয় স্পটের প্রতি। এরপর নদীপথে লঞ্চে, নৌকায় রাত্রিযাপনকেও ভ্রমণের অন্যতম অনুষঙ্গ করে তুলল। একটা সময় এসব স্পটেও এত বেশি জনসমাগম দেখা যায় যে ভ্রমণে গিয়ে নিজের মতো করে একটু সময় কাটানোই কষ্টকর হয়ে পড়ে! ফলে ভ্রমণপিপাসু মানুষজন নতুন নতুন চিন্তা

শুরু করল! তারা চায় একটু নিরিবিলি, প্রকৃতির সাথে, নদীর সাথে এবং ধুলাবালি-মাটির সঙ্গে মিশে যেতে। একই সাথে প্রাকৃতিক খাবার নিজের মতো করে খেতে। সেই ভাবনা থেকেই শুরু হয়েছে নতুন ট্যুরিজম। এ ট্যুরিজমকে বলা হচ্ছে চর ট্যুরিজম। চরের মানুষ খুবই সহজসরল ও সাদামাটা জীবনযাপন করে। শহরের মানুষ এলে তারা ভীষণ খুশি হয়। তাদের উৎপাদিত বাদাম, চালভাজা কিংবা কালাই ভেজে কিংবা অন্য কিছু খেতে খেতে চাঁদনি রাতে চরে বসে কিংবা মাচায় শুয়ে চাঁদ উপভোগ করা অন্যরকম অনুভূতি!

চর এলাকার মানুষজন কৃষিকাজ নির্ভর। কৃষিকাজ করার পরও অনেক জমি পতিত রয়ে যায়। অনেক এলাকায় সেখানে নিজস্ব জমিতে ভ্রমণপিপাসী মানুষজনকে থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। রান্নার আয়োজনও তারা করছে। ফলে চর এলাকার মানুষের জীবনমান যেমন উন্নত হচ্ছে শহরের মানুষেরও একটু গ্রামীণ পরিবেশে আনন্দে সময় কাটছে। ফলে আকর্ষণ বাড়ছে চর ট্যুরিজমের প্রতি। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের নতুন পর্যটন সম্ভাবনা হতে যাচ্ছে চর ট্যুরিজম।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি চর রয়েছে কুড়িগ্রাম জেলায়। কারণ কুড়িগ্রাম ১৬টি নদী দিয়ে বেষ্টিত। বাংলাদেশের আর কোনো জেলায় এত নদী নেই। চরগুলো নদীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কুড়িগ্রামের নদীবেষ্টিত অঞ্চলে প্রায় ৫৬৮টি চর রয়েছে! এত সংখ্যক চর বাংলাদেশের আর কোথাও নেই। চরের মানুষের একটা সময় ভীষণ কঠিন জীবনযাপন করতে হতো। এখন দেখা যাচ্ছে, চরের মধ্যে প্রচুর ফসল উৎপাদন হচ্ছে। তাই চরের মানুষের আগের সেই খাবারের কষ্ট তেমন একটা নেই বললেই চলে। তবে তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য দেশি-বিদেশি এনজিও এগিয়ে আসায় তাদের জীবনে লেগেছে শিক্ষা ও উন্নয়নের ছোঁয়া। এনজিওগুলো বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়ে কাজ করছে তিন দশক থেকে। ফলে তাদের জীবনে আগের চেয়ে কিছুটা উন্নত হয়েছে। সারাদেশ থেকে মানুষজন এসব চরে আসতে শুরু করায় কুড়িগ্রামে গড়ে উঠেছে চর ট্যুরিজম।

দারুণ খুশির বিষয় হলো– কুড়িগ্রামে চরের জীবন নিয়ে তরুণরা গড়ে তুলেছে চর জাদুঘর। চরাঞ্চলের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কুড়িগ্রামে চর জাদুঘর সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছে একদল তরুণ। জেলার সদর উপজেলার পাঁচগাছি ইউনিয়নের গারুহাড়া স্কুল বাজার এলাকায় একটি টিনের ঘরে অস্থায়ীভাবে এটি গড়ে তোলা হয়েছে।

এখানে রয়েছে চরে ব্যবহৃত মাটির হাঁড়ি-পাতিল, নারীদের হাতে তৈরি পাখা, পোশাক, কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, নদীর পানি ও ফসলের নমুনাসহ নানা সাংস্কৃতিক উপকরণ। স্থানীয় জলবায়ু অধিকারকর্মী স্বপন কুমার সরকার এই সংগ্রহশালা তৈরির পেছনে নেতৃত্ব দেন। এটি দেশের প্রথম চরভিত্তিক জাদুঘর দাবি করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'চরের মানুষের জীবন এতটা সংগ্রামে ভরা, অথচ সেই জীবনের গল্প কোথাও নেই। সবসময় আড়ালে রাখা হয়েছিল। আমরা চাই এই গল্পগুলো হারিয়ে না যাক; বরং বিশ্ব ও নতুন প্রজন্মের সামনে তা নির্ভুলভাবে তুলে ধরা হোক।' সিরাজুল ইসলাম নামে চরের এক বাসিন্দা জাদুঘরে রাখা হাতপাখা দেখে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, 'এই পাঙ্খাটা দেখে আমার শৈশবের কথা মনে পড়ে গেল। আমরা ছোটোবেলায় এমন পাখা দিয়ে অনেকে মিলে বাতাস নিতাম, এখন এগুলো হারিয়ে গেছে।'

প্রথম আলো চর

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার ঘোগাদহ ইউনিয়নে একটি চরের নাম প্রথম আলো। এর পূর্ব পাশ দিয়ে বয়ে গেছে দুধকুমার নদ। গঙ্গাধর ও ব্রহ্মপুত্রের নদ-নদীর কোলঘেঁষে ২০০৪ সালে চরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এ চরটি কুড়িগ্রাম শহর থেকে দুই কিলোমিটার দূরে।

কাশফুলে ছাওয়া চরটির মাঝে টিনের ঘর। চালে বাংলাদেশের পতাকা আঁকা। এটাই প্রথম আলো চর আলোর পাঠশালা। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই দেখছে নিজেদের চরকে এগিয়ে নেওয়ার স্বপ্ন। যে চরে বাস করে সাড়ে ৩০০ পরিবার।

এই চরে অনেকেই দলবেঁধে ঘুরতে যান। তাঁবু গেড়ে রাত্রিযাপন করেন। আনন্দময় সময় কাটান। এছাড়াও কুড়িগ্রামে যেসব চর আছে তার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদ ভারত থেকে বাংলাদেশে ঢুকেছে যে চরের পাশ দিয়ে, তার নাম অষ্টআশির চর। ওপারে ভারতের আসাম রাজ্যের ছালাপাড়া, তিনশো বিঘা, বুদাখার হাট। ব্রিটিশ আমলে এই নৌ পথ দিয়ে ভারতের সঙ্গে চলত ব্যবসা-বাণিজ্য। দেশভাগ আর নদ-নদীর পানি কমে যাওয়ায় নৌপথের ব্যবসা বন্ধ হয়েছে কয়েক দশক আগেই। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও মালামাল নিয়ে ভারতের মানুষ জন আসত যাত্রাপুর হাটে। সেদিন ফুরিয়েছে অনেক আগে। এখন এই হাট চলে আশপাশের চরবাসীদের কেন্দ্র করেই। ভগবতীর চর, ইটালুকান্দা, ফকিরেরচর, দৈ-খাওয়া, আইরমারী, সাহেবের আলগা, জাহাজের আলগা, ঝুনকারচর, কালিরআলগা, রলাকাটা, নারায়ণপুর,

বারোবিশ, চরকাঁপনা, নুন খাওয়া, শান্তিয়ার চর, মাদারগঞ্জ, কচাকাটা, শৌলমারীসহ ছোটো-বড়ো আড়াই শতাধিক চর থেকে মালামাল ও যাত্রী আনা-নেওয়ার কাজ করেন মাঝিরা।

তারুয়ার চর ও চর কুকরি মুকরি

বাংলাদেশের অসংখ্য চর আছে যেগুলো ইতোমধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এসব চরের মধ্যে তারুয়ার চর বিখ্যাত। কারণ তারুয়ার চরের সমুদ্রসৈকত পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান। প্রতি শীতেই সেখানে হাজার হাজার পর্যটকের ঢল নামে। ভোলা জেলার অন্যতম পর্যটন স্পট তারুয়ার চর। এটি ঢাল চরের একটি অংশ। সাহসী ও অতি উৎসাহী পর্যটক যান তারুয়ার চরে। সেখানে তারা রাতও কাটান। কেউ বা দিনে গিয়ে সন্ধ্যার আগেই কুকরি মুকরিতে ফেরার জন্য রওনা হন। মিনি সুন্দরবন খ্যাত চর কুকরি মুকরি থেকে ট্রলারে বা স্পিডবোটে যেতে হয় তারুয়ার চরে। চার-পাঁচ হাজার টাকায় ভাড়া করা যায় ট্রলার। তবে স্পিডবোটে ১০ হাজার টাকা লাগে। তারুয়ার চর শৌখিন পর্যটকদের জন্য। সেখানে থাকার সুবিধা অন্য পর্যটন স্পট কক্সবাজার বা কুয়াকাটার মতো নয়। ভালো মানের কোনো হোটেল নেই। একটি মাত্র হোটেল। টিনের বেড়া দেয়া ও টিনের ছাদের এ হোটেলে একত্রে ২০-২৫ জন থাকতে পারেন। নাম সোনিয়া রিসোর্ট। অন্যরা থাকেন তাঁবুতে। বিশেষ করে যারা তাঁবুতে থাকতে পছন্দ করেন তাদের জন্য অন্যতম আদর্শ এই তারুয়ার চর বিচ। বনের ধারে সাগর পাড়ে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে তরুণ পর্যটকরা ক্যাম্প করে থাকেন। কেউ সাথে করে নিয়ে আসেন তাঁবু। আবার স্থানীয়ভাবেও তাঁবু পাওয়া যায়। সাদা বালুর এই বিচে দারুণ উপভোগ করেন পর্যটকরা। পাশেই সবুজ প্রান্তরে চরে বেড়ায় শত শত গরু, মহিষ ও ছাগল-ভেড়া।

তারুয়ার চর ও কুকরি মুকরি যেতে পর্যটকরা ঢাকা সদরঘাট থেকে সন্ধ্যায় ভোলার চর ফ্যাশনের বেতুয়াগামী লঞ্চে উঠেন। এরপর সারারাত লঞ্চ ভ্রমণ শেষে ভোরে বেতুয়া ঘাটে পৌঁছান। সেখানে সকালের নাশতা শেষে অটোতে করে কচ্চইবার ঘাটে পৌঁছে ট্রলারে বা স্পিডবোটে চর কুকরি মুকরি যান। এরপর অটোতে কুকরি মুকরির খাল পাড়ে পৌঁছাতে হয়। সেখান থেকে বনের ভেতর দিয়ে ১০-১২ মিনিটের হাঁটা পথ শেষে চর পালিতা ডোশ বা চর পাতিরা খালের পাড়ে থাকে ট্রলার। সেখান থেকে ট্রলারে দেড় ঘণ্টার পানি পথ পেরিয়ে তারুয়ার চরে পৌঁছান তারা।

মাঝের চর

মাঝের চর। ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন-ঘেঁষা বলেশ্বর নদের মধ্যবর্তী একটি চর। নদতীর থেকে কিংবা আকাশ থেকে দেখলে মনে হবে একেবারেই একটি 'সবুজ দ্বীপ'। উপকূলীয় জেলা পিরোজপুরের জিয়ানগর উপজেলা পার হয়ে বলেশ্বর নদ মাঝের চর দ্বারা দুই ভাগ হয়ে আবারও একই স্রোতধারায় প্রবাহিত হয়েছে। প্রায় ৬৪০ একর জমির ওপর বলেশ্বর নদের বুকে গড়ে ওঠা মাঝের চর দৈর্ঘ্যে প্রায় ২ দশমিক ৫ কিলোমিটার এবং প্রস্থে এক দশমিক ৪ কিলোমিটার। আর সুন্দরবনের তটরেখা থেকে মাঝের চরের দূরত্ব প্রায় ৪ কিলোমিটার। বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলার সাউথখালী ইউনিয়নের তাফালবাড়ী নামক স্থান থেকে নদীপথে মাঝের চরের দূরত্ব এক থেকে দেড় কিলোমিটার। আর পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলা থেকে নদীপথে দূরত্ব দুই থেকে তিন কিলোমিটার। এ চরের এক অংশ শরণখোলা ও অন্য অংশ মঠবাড়িয়ায় পড়েছে। এই মাঝের চর ঘিরে তৈরি হচ্ছে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। পর্যটনকে অগ্রাধিকার দিয়ে এখানে এক্সক্লুসিভ ইকো ট্যুরিজম পার্ক স্থাপন করা যায় কি না এর পরিকল্পনা করছে সরকার।

একসময় এ চরজুড়ে শুধু বালু থাকলেও ৬০-৭০ বছর আগে থেকে এখানে গজিয়েছে ছৈলা, কেওড়াসহ বিভিন্ন জাতের গাছপালা। এছাড়া রয়েছে সুন্দরবনের মতোই গুল্ম-লতা আর গোলপাতা। চরটিতে জনমানুষের বসবাসও আছে। সুন্দরবনে, বলেশ্বর নদে ও সাগরে মাছ ধরেন এমন জেলেরা বিভিন্নভাবে এ চর ব্যবহার করে থাকেন। সুন্দরবনের তটরেখার কাছাকাছি হওয়ায় এ বনের অনেক বৈশিষ্ট্যই এ চরে বিদ্যমান।

চর হেয়ার

বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে ওঠা এক অনিন্দ্য সুন্দর স্থান চর হেয়ার। স্থানীয়দের কাছে কলাগাছিয়ার চর হিসেবে পরিচিতি পেলেও বর্তমানে এটি চর হেয়ার নামে বেশ পরিচিত। জেগে ওঠা এই চরের পূর্বপাশে রয়েছে বন বিভাগের সংরক্ষিত বনভূমি সোনারচর। পশ্চিমে চর তুফানিয়া, উত্তরে টাইগার দ্বীপ এবং এর পাশে আছে চর কাশেম। কুয়াকাটা থেকে সাগরপথে এই চরের দূরত্ব ৩৫.১৯ কিলোমিটার। আর রাঙ্গাবালী উপজেলা থেকে চরটির দূরত্ব ১০ কিলোমিটার। পরিচ্ছন্ন আর নির্ঝঞ্ঝাট এই চরে রয়েছে চার কিলোমিটার দীর্ঘ বালুকাময় সৈকত।

কুয়াকাটা থেকে পর্যটকরা ইঞ্জিনচালিত ট্রলার কিংবা স্পিডবোটে করে সহজেই এই চর হেয়ারে আসতে পারেন। সেখান থেকে সোনারচর কিংবা চর মন্তাজের বিভিন্ন পর্যটন স্পটগুলো ঘুরে আবার চর মন্তাজ থেকে লঞ্চযোগে সহজেই ঢাকায় ফেরার সুযোগ রয়েছে। একইভাবে ঢাকা থেকে সরাসরি দোতলা লঞ্চে করে চর মন্তাজ হয়ে চর হেয়ার ঘুরে কুয়াকাটা থেকে ঢাকার ফিরতে পারেন। যেসব পর্যটকরা কিছুটা অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়, তাদের জন্য একটি নতুন সুযোগ তৈরি হবে।

এদিকে নতুন সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় কুয়াকাটার পর্যটন ব্যবসায়ীরা চর হেয়ারে ভ্রমণের জন্য প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে একজন

পর্যটন দুই দিন এক রাত এখানে ভ্রমণ করতে পারছেন।

দুবলার চর

শীতেই প্রকৃতি সবচেয়ে সুন্দরভাব পর্যটকের কাছে ধরা দেয়। তেমনই এক স্থান হলো সুন্দরবনের দুবলার চর। দুবলার চর বাংলাদেশ অংশের সুন্দরবনের দক্ষিণে, কটকার দক্ষিণ-পশ্চিমে ও হিরণ পয়েন্টের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত একটি দ্বীপ। হরিণের জন্য বহুল পরিচিত এই স্থান। কুঙ্গা ও মরা পশুর নদের মাঝে এটি ৮১ মাইলের একটি বিচ্ছিন্ন চর। আলোরকোল, হলদিখালি, কবরখালি, মাঝেরকিল্লা, অফিসকিল্লা, নারকেলবাড়িয়া, ছোটো আমবাড়িয়া ও মেহের আলির চর নিয়ে দুবলার চর গঠিত।

দুবলার চর মূলত জেলে গ্রাম। মাছ ধরার সঙ্গে শুঁটকি শুকানোর কাজ চলে সেখানে। দুবলার চরে গেলে দেখতে পাবেন শুঁটকি পল্লি ও কীভাবে শুঁটকি প্রক্রিয়াজাত করা হয়। রয়েছে শুঁটকির বাজার। সেখানেও দেখতে পাবেন হরেক রকমের শুঁটকির পসরা সাজিয়ে বসে আছে দোকানদাররা। দুবলার চরের শুঁটকি দামেও তুলনামূলক সস্তা আবার সেরাও বটে। এই চরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করে। বিশেষ করে চরে লাল বুক মাছরাঙা, মদনটাক পাখির দেখা পাওয়া যায়। পর্যটকরা সবচেয়ে বেশি উদগ্রীব থাকে হরিণ দেখার জন্য। দুবলার চরে হাঁটলে আপনি নানা প্রজাতির বন্যপ্রাণীর দেখবেন। এছাড়া চরের চারপাশে পানি থাকায় এখানে নানা প্রজাতির মাছ ও জলজ উদ্ভিদের দেখা পাবেন। আরও হাঁটলে সেখানকার জনজীবন দেখতে পাবেন। সেখানকার মানুষের জীবনধারা কতটা বৈচিত্র্য তা অনুধাবন করতে পারবেন। মাছ ধরাও দেখতে পাবেন খুব কাছ থেকে।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের রাসমেলা ও পুণ্যস্নানের জন্যও দ্বীপটি বিখ্যাত। প্রতিবছর কার্তিক মাসে সেখানে রাসমেলা অনুষ্ঠিত হয়। ২০০ বছর ধরে এ রাসমেলা চলছে। প্রতিবছর অসংখ্য পুণ্যার্থী রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ভিড়েন এই দ্বীপে।

দুবলার চরের রাসমেলায় স্থানীয় লোকজন ছাড়াও দূর-দূরান্তের শহরবাসী এমনকি বিদেশি পর্যটকেরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়ে থাকেন। তিন দিনব্যাপী এ মেলায় অনেক বিদেশি পর্যটকও ছুটে আসেন দুবলার চরে। সুন্দরবনের পাশে সাতক্ষীরা শহরে সাধারণ মানের হোটেল ও শ্যামনগরের মুন্সিগঞ্জে এনজিও সুশীলনের রেস্টহাউস ও ডরমেটরিতে একক, পরিবার ও গ্রুপ নিয়ে থাকার সুবিধা আছে।

মংলায় পর্যটন কর্পোরেশনের হোটেল, পশুর বন্দরে সাধারণ হোটেল আছে পর্যটকদের জন্য। খুলনা মহানগরে হোটেল রয়েল, ক্যাসেল সালাম, হোটেল টাইগার গার্ডেন, হোটেল ওয়েস্ট ইন, হোটেল সিটি ইন, হোটেল মিলিনিয়াম ইত্যাদি মানসম্পন্ন হোটেল ছাড়াও সাধারণ মানের হোটেল আছে।

কাউয়ার চর

দেশের উপকূলীয় সৌন্দর্যের মানচিত্রে নতুন করে যুক্ত হয়েছে বরগুনার কুয়াকাটার নিকটবর্তী কাউয়ার চর। অনবদ্য ঝাউবন, লাল কাঁকড়ার পদচারণা, সাগরলতা, সাদা বালিয়াড়ি এবং নদী-সাগর মিলনমেলার অনন্য পরিবেশের কারণে দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে এই স্থানটি। কুয়াকাটা ভ্রমণে যারা ভিন্ন স্বাদের অভিজ্ঞতা খোঁজেন, তাদের জন্য কাউয়ার চর হয়ে উঠেছে অন্যতম আকর্ষণ।

কাউয়ার চরে যাওয়ার পথে প্রথমেই চোখে পড়ে আলীপুর ও মহিপুরের প্রাণবন্ত মাছের আড়তগুলো। ভোরে ঘাটে সারি সারি ট্রলারে ভরে ওঠে নানা ধরনের সামুদ্রিক মাছ–চিংড়ি, বেল ঘাগড়া, রূপচাঁদা, কোরালসহ বহু প্রজাতি। এসব আড়ত পর্যটকদের জন্য যেমন একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা, তেমন এলাকার অর্থনীতিতেও রাখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পথে রয়েছে ঐতিহাসিক আমখোলা পাড়া। প্রায় ২০০ বছরের পুরোনো এই পুকুরকে কুয়াকাটার প্রথম খনন করা মিষ্টি পানির উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তালগাছঘেরা শান্ত পরিবেশ এবং স্থানীয়দের কাছে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব পর্যটকদের টেনে নেয়। এখানকার চারপাশ ঘুরে দেখতে প্রতিদিন বহু দর্শনার্থী থামে। তাহেরপুর হয়ে লেবুর বনের পথে এগোলে বদলে যায় দৃশ্যপট। নাম লেবুর বন হলেও এখানে মূলত দেখা মেলে কেওড়া, গেওয়া, গরান, কড়ই, গোলপাতা এবং সৈকতীয় পরিবেশে জন্মানো অন্য অনেক গাছের। কিছু মৃত বৃক্ষের অদ্ভুত আকার পুরো এলাকাজুড়ে সৃষ্টি করেছে প্রাগৈতিহাসিক পরিবেশের মতো অনুভূতি। প্রায় হাজার একর আয়তনের এই বন পর্যটকদের মনে ছাপ ফেলে। অন্যদিকে আন্ধারমানিক এলাকায় ভাটার সময়ে বালিয়াড়ি এবং শান্ত সাগরের ভিন্ন রূপ দেখা যায়। সন্ধ্যায় সাগরপাড়ের স্থানীয় দোকানগুলোতে তাজা সামুদ্রিক মাছ ও কাঁকড়া ভাজার প্রস্তুতি পর্যটকদের কাছে হয়ে ওঠে বাড়তি আকর্ষণ। ভোরবেলায় কাউয়ার চরের পথে পাড়ি দিলে সৈকতের দুই ধারের ঝাউবন

এবং পায়রা নদীর মোহনা মুগ্ধ করে। প্রায় সাত কিলোমিটার দীর্ঘ ঝাউবনের ভেতর দিয়ে হেঁটে বা মোটরবাইকে যাওয়া যায়। এখানে রয়েছে প্রায় বিলুপ্তপ্রায় সাগরলতার উপস্থিতি, আর বালুচরে কোথাও কোথাও দেখা যায় শব্দ পেলেই গর্তে লুকিয়ে পড়া লাল কাঁকড়া– যা এ এলাকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কাউয়ার চরের আরেক দর্শনীয় স্থান বটতলীর হামিদ সি প্যালেস। প্রায় ৩০০ বিঘা আয়তনের এই সবুজ বেষ্টনীতে রয়েছে হাজারো তালগাছ, দেশি গরুর খামার, মাছের ঘের এবং স্বর্ণ-৫ জাতের ধানক্ষেত। প্যালেসের দোতলা নান্দনিক বাংলো থেকে চারপাশের ঝাউবন ও সবুজ প্রকৃতি এক নজরে দেখা যায়। সামুদ্রিক ইলিশ দিয়ে তৈরি স্থানীয় খিচুড়ি এই এলাকার জনপ্রিয় খাবারের মধ্যে একটি।

ঢাকা থেকে কুয়াকাটায় সরাসরি বাস চলাচল করে। কুয়াকাটায় রয়েছে প্রচুর হোটেল ও রিসোর্ট। কুয়াকাটা থেকে কাউয়ার চরে যেতে মোটরবাইক, অটো বা ভ্যানগাড়ি ব্যবহার করা যায়। চাইলে সকালে গিয়ে দুপুরে ফিরে আসা সম্ভব। কাউয়ার চরে থাকতে চাইলে তাঁবু স্থাপন করা যায়, পাশাপাশি স্থানীয়দের সহায়তা বা নিকটবর্তী গঙ্গামতিতে থাকার ব্যবস্থাও পাওয়া যায়।

আরও কিছু চর

নোয়াখালীর হাতিয়া, ভোলার মনপুরা কিংবা পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালির মতো প্রাচীন ও সুপরিচিত জনপদের বাইরেও জেগে উঠছে আরও অনেক নতুন চর ও দ্বীপ, যেখানে এখনো স্থায়ী মানববসতি নেই। কিছু জায়গায় আছে ম্যানগ্রোভ অরণ্য, বন বিভাগের লাগানো গাছ। হয়ত আরও ৫০-১০০ বছর পর মানুষের বসবাসের উপযোগী হবে এসব চর। তজুমদ্দিন, হাকিমুদ্দিন, বোরহানউদ্দিন, দৌলতখান, শাহবাজপুর, চর মন্তাজ, চর মানিকা, চর কাজল, দেবীর চর, সোনার চর, চর হেয়ার, চর লরেন্স, চর ফ্যালকন। বোঝাই যায় চর জেগে ওঠার পর যেসব সাহসী মানুষ বা তাদের অনুচরেরা এসব চরে প্রথম দখল নেন, তাঁদের নামেই নাম। কোনো চরের নামের সঙ্গে মিশে আছে ইংরেজ ও পর্তুগিজ দস্যুদের ছাপ।

উপকূলে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে সাদা বালুর নির্জন সৈকত। কোথাও ঝাউবন, কোথাও সাগরলতার ঝাড়। জোয়ারের সময় তীব্র সাগরগর্জন, ভাটার সময় ঝিনুকে ভরা তটরেখা। রাতে চাঁদের আলোয় ঝলমলে সৈকত, আকাশজোড়া তারা আর উল্কাপাতের দৃশ্য ভ্রমণকে করে তুলবে অবিস্মরণীয়। চাইলে ঝাউগাছের ছায়াতলে কিংবা সবুজ ঘাসে ছাওয়া খোলা প্রান্তরে ক্যাম্পিংও করা যাবে।

কুকরি মুকরি, চর মন্তাজ, ঢালচর, মনপুরার মতো দ্বীপে আছে রাত যাপনের ব্যবস্থা। তবে যেসব দ্বীপে থাকার সুযোগ নেই, সেখানে গেলে তাঁবু সঙ্গে নিতে হবে। দলবল নিয়ে গেলে ক্যাম্পিং হবে অন্য রকম এক অভিজ্ঞতা।

এই যে এতগুলো চরের নাম জানলাম আমরা। বাংলাদেশের দর্শনীয় স্থানগুলোর সঙ্গে এসবও যোগ হচ্ছে ক্রমান্বয়ে। আমাদের রূপসী বাংলার প্রতিটি স্থানই হয়ে উঠতে পারে দর্শনীয়। শুধু প্রয়োজন আমাদের ব্যবস্থা নেওয়া। সেই সঙ্গে সচেতনতা এবং সরকারি পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ। তাহলেই বিকশিত হবে অন্যান্য ট্যুরিজমের মতো চর ট্যুরিজমও। বাংলাদেশের মানুষের পাশাপাশি তখন বিদেশিরাও চর ট্যুরিজম স্পট দর্শনে আগ্রহী হয়ে উঠবে। আমাদের জীবনমানও হবে উন্নত। তাই বাংলাদেশের প্রতিটি চর হয়ে উঠুক আগামী সম্ভাবনাময় ট্যুরিজম খাত।

মো. আবদুল কাদের: সাহিত্যিক ও সম্পাদক-প্রকাশক

রাজশাহীতে ১৩টি ও নাটোরে চারটি প্রকল্পের উদ্বোধন

স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ৯ই আগস্ট রাজশাহী সার্কিট হাউসে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার ১৩টি এবং নাটোর সার্কিট হাউসে ভার্চুয়ালি নাটোরে চারটি প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৩টি নির্মাণকাজের মধ্যে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের অধীন একটি এবং অবশিষ্ট ১২টি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) প্রকল্প।

রাজশাহীতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা প্রকল্পগুলো হলো- রাজশাহী দূর্গাপুরে কালীগঞ্জ ও মোহনপুরে বীরকুৎসা হাটে দুইতলা গ্রামীণ হাট ভবন, বাগমারা উপজেলার একডালা ভূমি অফিস এবং তানোরে কাশেম বাজার হতে বায়া রাস্তার প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ। অন্যদিকে মোহনপুরে ধোরসা, বাঘার চক ছাতারী ও গোদাগাড়ীর সোনাদিঘি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবন, নগরীর লক্ষ্মীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারতলা নবনির্মিত ভবন, নগরীর হড়গ্রাম নতুনপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত দুইতলা ভবন, চারঘাটে নিমপাড়া-হাবিবপুর খালের পলি অপসারণ কাজ, পবায় হরিপুর হাটের নবনির্মিত দুইতলা মার্কেট ভবন, গোদাগাড়ী ৭২ মিটার দীর্ঘ পাস্তাপাড়া-কদমশহর ভাগাইল ব্রিজ নির্মাণ কাজ এবং রাজশাহী কেন্দ্রীয় ঈদগাহের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন শেষে উপদেষ্টা দোয়ায় অংশ নেন।

নাটোরে উদ্বোধনকৃত প্রকল্পগুলোর মধ্যে হচ্ছে সিংড়া-বারুহাস-তাড়াশ সড়ক উন্নয়ন, সোনাপুর হাটে দুইতলা বিশিষ্ট গ্রামীণ বাজার ভবন নির্মাণ, চামড়ী ইউপি-বিলদহর বাঁশহাট মড়া আত্রাই নদীর উপর ১০৮ দশমিক ১০ মিটার পিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ, দত্তপাড়া আরএইচডি হতে নাজিরপুর জিসি হালসা জিসি সড়ক উন্নয়ন চেইনজ।

প্রতিবেদন: জিনাত রহমান

চলচ্চিত্র নির্মাণের যাত্রা

সাইফুল ইসলাম মান্নু

আপনারা কি কখনও গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন একটি চলচ্চিত্রের জন্ম আসলে কোথা থেকে?

আমরা প্রেক্ষাগৃহে যে ঝলমলে দৃশ্যাবলী, আবেগপূর্ণ সংলাপ এবং রঙিন চরিত্রমালা প্রত্যক্ষ করি, তার নেপথ্যে থাকে এক দীর্ঘ ও পরিশ্রমসাধ্য সৃজন-অভিযাত্রা। একটি চলচ্চিত্র কখনও হঠাৎ করেই জন্ম নেয় না; এর উৎপত্তিতে নিহিত থাকে এক ক্ষুদ্র অথচ গভীরতর ভাবনায় একটি আইডিয়ায়। সেই ক্ষুদ্র ভাবনা নির্মাতার মনের অন্তঃস্থলে প্রথমে অঙ্কুরিত হয়, ধীরে ধীরে বীজ থেকে চারা, আর চারাগাছ থেকে এক মহীরুহে পরিণত হয়ে অবশেষে আত্মপ্রকাশ করে চলচ্চিত্ররূপে।

চলচ্চিত্রকে তাই কেবলমাত্র বিনোদনের উপকরণ হিসেবে দেখা যায় না। এটি মূলত একটি সৃজনশীল সাধনা, যেখানে নির্মাতা হয়ে ওঠেন চিন্তার ভাস্কর, সময়ের কাহিনিকার এবং দৃশ্যমান ভাষার কবি।

ধাপ ১: প্রেরণা ও সিদ্ধান্ত (Inspiration & Decision)

প্রত্যেক চলচ্চিত্রের আদি উৎস হলো প্রেরণা। এই প্রেরণা কখনও নির্মাতার নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভেতর থেকে উন্মেষ লাভ করে, কখনও সমাজবাস্তবতা ও ইতিহাসের দুঃসহ সত্য থেকে, আবার কখনও আসে এক অমোঘ প্রশ্নের আকারে—

'যদি একজন সাধারণ মানুষ হঠাৎ এক অনিবার্য ষড়যন্ত্রের

ঘূর্ণাবর্তে পতিত হয়, তবে কী ঘটতে পারে?'

এই প্রশ্নই নির্মাতার সৃজনশীল মনোজগতে আলোড়ন তোলে। ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি এক অব্যক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন 'আমি এই গল্পকে পর্দায় রূপ দেবো।'

সত্যজিৎ রায়ের *পথের পাঁচালী*-এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি গ্রামীণ জীবনের স্বপ্ন, দারিদ্র্য ও সৌন্দর্যকে বিশ্বদরবারে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন, যা ছিল একাধারে মানবিক ও শিল্পসম্মত প্রেরণার ফসল।

ধাপ ২: গল্প নির্বাচন ও বিকাশ (Story Selection & Development)

চলচ্চিত্র নির্মাণের দ্বিতীয় স্তর হলো গল্প নির্বাচন। এটি এক জটিল ও দায়িত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া।

• প্রথমত, নির্ধারিত হয় কনসেপ্ট (Concept)—গল্পের মূল ভাবনা বা সারবত্তা।

• এরপর রচিত হয় লগলাইন (Logline)—hv এক লাইনে গল্পের সারসংক্ষেপ। যেমন: 'A poor boy dreams of becoming a doctor against all odds.'

এরপর চরিত্রসমূহ নির্ধারণ করা হয়।

• প্রোটাগনিস্ট (Protagonist): কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র।

• অ্যান্টাগনিস্ট (Antagonist): যিনি বা যেটি গল্পে সংঘাতের উৎস।

• ক্যারেক্টার আর্ক (Character Arc): চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ও আবেগীয় রূপান্তরের যাত্রা।

গল্পের ভেতরকার বিন্যাস সাধারণত থ্রি-অ্যাক্ট স্ট্রাকচার (Three Act Structure) অনুসারে গঠিত হয়।

১. Set-up: চরিত্র ও পরিবেশের পরিচিতি।

২. Conflict: সংঘাত ও জটিলতার বিকাশ।

৩. Resolution: চূড়ান্ত সমাধান ও পরিণতি।

পথের পাঁচালীতে যেমন প্রথমে আমরা পরিবারের দারিদ্র্য দেখি, মাঝখানে তাদের সংগ্রাম, আর শেষে জীবনধারার বাধ্যতামূলক পরিবর্তন।

ধাপ ৩: গল্পকে স্ক্রিপ্টে রূপান্তর (Transforming Story into Script)

একটি গল্প কেবল মনের ভেতর থাকলে তা চলচ্চিত্রে রূপ নেয়

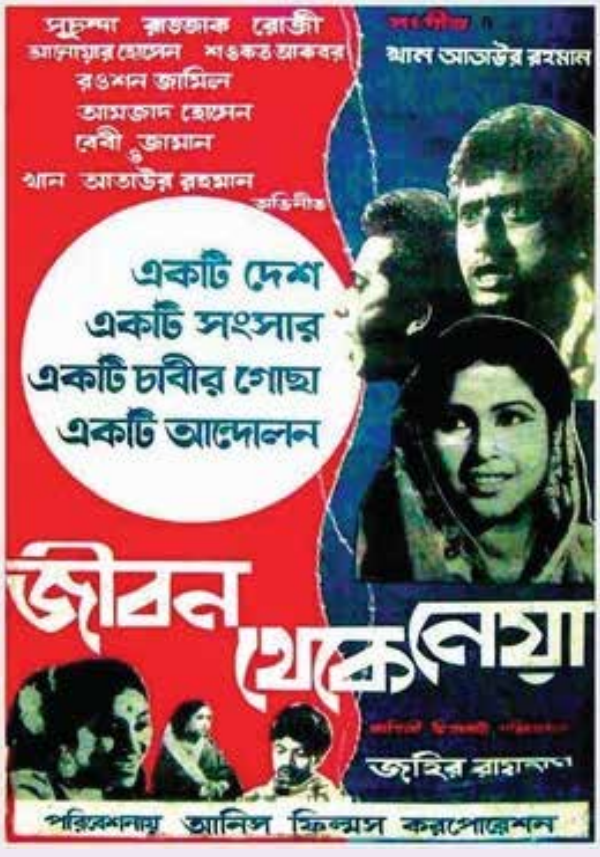

না। গল্পকে লিখিত ও গঠিত আকারে রূপান্তর করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত-

১. সিনোপসিস (Synopsis): গল্পের সারসংক্ষেপ।

২. ট্রিটমেন্ট (Treatment): গল্পকে ধারাবাহিকভাবে অধ্যায় ও সিকোয়েন্সে ভাগ করা।

৩. আউটলাইন (Outline): দৃশ্য-ভিত্তিক বিন্যাস।

৪. স্ক্রিনপ্লে (Screenplay): পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য, যেখানে থাকে।

• সিন হেডিং (Scene Heading): যেমন—EXT. VILLAGE ROAD – DAY

• অ্যাকশন লাইন (Action Line): চরিত্রের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা।

• ডায়ালগ (Dialogue): চরিত্রের মুখের ভাষ্য।

• সাবটেক্সট (Subtext): সংলাপের আড়ালে নিহিত অন্তর্নিহিত অর্থ।

• ট্রানজিশন (Transition): CUT TO, DISSOLVE TO ইত্যাদি ভিজ্যুয়াল পরিবর্তন।

একটি মাত্র লাইন দিয়েও কাহিনির আবহ সৃষ্টি করা সম্ভব। যেমন টাইটানিক চিত্রনাট্যের সূচনায় লেখা।

'FADE IN: A deep blue sea, a gigantic ship appears.'

মাত্র কয়েকটি শব্দেই দর্শক প্রবেশ করে গল্পের নন্দন-ভুবনে।

ধাপ ৪: সংশোধন ও পরিমার্জন (Revision & Refinement)

কোনো চিত্রনাট্যের প্রথম খসড়াই চূড়ান্ত নয়। এটি বার বার সংশোধনের মাধ্যমে শৈল্পিক উৎকর্ষে পৌঁছায়।

• রিরাইট (Rewrite): অসংখ্যবার খসড়া পরিবর্তন।

• ডায়ালগ পরিমার্জন: সংলাপকে স্বাভাবিক ও মানবিক করা।

• পেসিং (Pacing): কোথায় দ্রুত, কোথায় ধীরগতি গল্পের ছন্দ নিয়ন্ত্রণ।

• ভিজ্যুয়াল স্টোরিটেলিং (Visual Storytelling): সংলাপের পরিবর্তে দৃশ্য ও ভিজ্যুয়াল চিহ্নের মাধ্যমে গল্প বলা।

উদাহরণস্বরূপ, তারেক মাসুদের *মাটির ময়না* চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাস্তবতা প্রকাশিত হয়েছে দৃশ্যপটের নীরব অথচ শক্তিশালী ভিজ্যুয়াল বর্ণনায়, যেখানে সংলাপের চেয়ে দৃশ্যই অধিকতর বোধগম্য হয়ে ওঠে।

চলচ্চিত্র নির্মাণের যাত্রা হলো এক অনন্য সৃজন-অভিযাত্রা। এটি শুরু হয় ক্ষুদ্রতম একটি আইডিয়া থেকে, যা রূপ নেয় আইডিয়া কনসেপ্ট লগলাইন ট্রিটমেন্ট স্ক্রিনপ্লে রিরাইট চলচ্চিত্র।

সুতরাং, চলচ্চিত্র কখনোই কেবল আলো-ছায়া বা প্রযুক্তির সমন্বয় নয়। এটি নির্মাতার অন্তর্লোকের স্বপ্ন, সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবিক বোধের এক অনির্বাণ প্রতিফলন।

আপনারা যারা আগামীর চলচ্চিত্র নির্মাতা, তাদের উদ্দেশ্যে আমার পরামর্শ প্রতিদিন চারপাশ থেকে একটি ক্ষুদ্র আইডিয়া লিখে রাখুন। মনে রাখবেন, হয়ত সেই ক্ষুদ্রতম চিন্তাই একদিন হয়ে উঠবে আপনার জীবনের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র।

সাইফুল ইসলাম মান্নু: লেখক

১৪টি উপজেলা মিনি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বাস্তবায়নাধীন 'উপজেলা পর্যায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-২য় পর্যায়' প্রকল্পের আওতায় ১৪টি উপজেলা মিনি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১৫০টি মিনি স্টেডিয়ামের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়ামের নির্মাণকাজ যথাযথ সময়ে সম্পন্ন হবে। তরুণদের ভাগ্য উন্নয়নে বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে ক্রীড়াক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের কাজ করছে। তারই অংশ হিসেবে ৯ই আগস্ট ১৪টি উপজেলা মিনি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করা হয়। উপদেষ্টা নাটোর সদর উপজেলা মিনি স্টেডিয়াম সরাসরি এবং আরও ১৩টি মিনি স্টেডিয়াম ভার্চুয়ালি উদ্বোধন শেষে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

উল্লেখ্য, প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ২০১৬ সালের জুলাই থেকে ২০১৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৭ হাজার ৪১১ দশমিক ১১ লাখ টাকা ব্যয়ে ১২৫টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় ২০২১ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত মেয়াদে ১ লাখ ৬৪ হাজার ৯৩২ দশমিক ৫২ লাখ টাকা ব্যয়ে ১৮৬টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। এর পাশাপাশি, দ্বিতীয় পর্যায়েরই একটি সংশোধিত প্রস্তাব-১ম সংশোধিত ডিপিপি-২ লাখ ৮৫ হাজার ৫৪২ লাখ টাকা ব্যয়ে ২০২১ সালের জুলাই থেকে ২০২৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত মেয়াদে মোট ২০১টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে উত্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়েরও কাজ শুরু করার প্রস্তুতি চলছে। ১২০টি উপজেলায় ৭৪ হাজার ৯১৮ লাখ টাকা ব্যয়ে জমি অধিগ্রহণ এবং অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত মেয়াদে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রতিবেদন: শ্রেয়ান দে

শরৎ মেঘে আলিঙ্গন

ইমরুল ইউসুফ

শরতের ভোর। শিশিরসিক্ত সবুজ পাতা। ছড়িয়ে পড়ল সূর্যের সোনালি আভা। মুহূর্তেই পাল্টে গেল প্রকৃতির রূপ। গ্রামের দূর্বা কোমল মেঠোপথ। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাওয়া। মনে হয় মুক্তাখচিত সবুজ গালিচা বিছানো। শিশিরভেজা অজস্র শেফালির সুগন্ধে বিমোহিত করা চারদিক। দুপুরে রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরি। ঝিরঝিরে বাতাস। ধানক্ষেতের সবুজ ঢেউ। এসব সবাইকে আনমনা করে তোলে। কারণ শরৎ বাংলার রূপবতী ঋতু। এক কথায়, সৌন্দর্যের পুরোধা। শরতের শিউলি ঝরার আনন্দ, কাশফুলের দুলুনি, মেঘমুক্ত আকাশে নীলের সমারোহ আমাদের আনন্দের সাগরে ভাসায়।

এক কথায় অসাধারণ সৌন্দর্যে ভরপুর শরৎ। শরতের অপূর্ব ভালো লাগার দৃশ্য, সৌন্দর্য বর্ণনা করতে কবি-সাহিত্যিকরা রচনা করেছেন বহু কবিতা, গান। কলমের ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন শরতের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য। শরতের অনুপম সৌন্দর্যের প্রতি মোহিত হয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন– 'এসেছে শরৎ, হিমেল পরশ/লেগেছে হাওয়ার পরে/সকাল বেলায় ঘাসের আগায়/শিশিরের রেখা ধরে/গগনে গগনে বরষণ শেষে/মেঘেরা পেয়েছে ছাড়া/বাতাসে বাতাসে ফেরে ভেসে ভেসে/নাই কোনো কাজে তাড়া।' জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আনমনে সুর তুলেছিলেন– 'এসো শারদ প্রাতের পথিক এসো শিউলি-বিছানো পথে/এসো ধুইয়া চরণ শিশিরে এসো অরুণ–কিরণ-রথে।' কবি আল মাহমুদ শরতের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন তার কাব্যে। তিনি লিখেছেন– 'বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে শরতের উদারতা, মেঘ ভেসে যায় মাথার ওপরে বৃষ্টির ছোঁয়া দিয়ে, ইচ্ছা হয় না ঘরের ভেতর বসে থাকি সারাদিন। কিন্তু বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা টান লাগে সারা বুকে, মনে হয় যেন আমার বক্ষে কান পেতে আছে কেউ, আজ সারাদিন হাওয়ার মাতম বইছে বাঁধন ছিঁড়ে।'

সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি কালিদাস শরৎকে নববধূর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তার বর্ণনায়–কাশফুলের মতো যার পরিধান, প্রফুল্ল পদ্মের মতো যার মুখ, উন্মত্ত হাঁসের ডাকের মতো রমণীয় যার নূপুরের শব্দ, পাকা শালিধানের মতো সুন্দর যার ক্ষীণ দেহলতা, অপরূপ যার আকৃতি–সেই নববধূর মতো শরৎকাল আসে (কালিদাস, ঋতুসংহার)। বৈষ্ণব পদাবলির অন্যতম প্রধান কবি বিদ্যাপতি ভরা ভাদ্র মাসেও তাঁর মনের শূন্যতা অনুভব করে বলেছিলেন– 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর/এ ভরা বাদর মাহ ভাদর/শূন্য মন্দির মোর।' শরতের নৈসর্গিক রূপের সঙ্গে একটি দার্শনিক রূপও আছে। শরৎকে যে নববধূ বলা হয় তার দার্শনিক ব্যাখ্যা হলো বধূর সন্তান ধারণের মতোই শরতের গর্ভে জন্ম নেয় নানা ফুল ও ফসল। বর্ষার ভেজা মাটি শরতে ক্রমশ শুকনো ও উর্বর হতে থাকে। শরতে মাটির এ উর্বরতার সূচনা হয় শস্যের বীজকে মাটির গর্ভে ধারণ করার প্রয়োজনেই। ফসল কাটার ঋতু হেমন্তে আমরা যে শস্য ঘরে তুলি সে শস্য শরতের গর্ভেই জন্ম নেয় ও বেড়ে ওঠে।

শরৎ শান্ত ও মধুর। অপার সৌন্দর্যে বিমোহিত থাকে প্রকৃতি ও মানুষ। চারদিক হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। উদাস করে তোলে মন। সুশোভিত করে তোলে দেহ-মন সারাক্ষণ। শরৎ তার সৌন্দর্য ও শুভ্রতায় অনন্য। নান্দনিক রূপ প্রকাশ পায় শরৎ রাতের নীল আকাশে। প্রকৃতির রূপলাবণ্য দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। সৌন্দর্যবোধ, চেতনা থাকলেই শরৎ প্রকৃতির সৌন্দর্য চোখে পড়বে। তবে বেশির ভাগ সময়ই আকাশজুড়ে ভেসে বেড়ায় তুলার মতো শুভ্র মেঘের সারি।

শরতের আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় যেন কোনো চিত্রশিল্পীর রংতুলির আঁচড়ে সযত্নে আঁকা সুনিপুণ এক চিত্রকর্ম। সে এক কাব্যিক অনুভূতি, যা কিছুক্ষণের জন্য হলেও মনকে ভাবুক করে তোলে। দৈনন্দিন কর্ম ব্যস্ততায় জানালার গ্রিলের ফাঁকে এক টুকরা গাঢ় নীল আকাশ আর শুভ্র মেঘের ছোটাছুটি। মানুষের নাগরিক চোখকে স্বস্তি দেয়, দেয় সতেজতা, প্রাণচাঞ্চল্য।

ঋতুরাজ বসন্তের যেমন রয়েছে রঙের বা বর্ণের ঐশ্বর্য আর রূপের রাজকীয় অহংকার; শরতের তেমনি রয়েছে সৌম্য, নির্মল সৌন্দর্য আর শান্ত ভাবমূর্তি। নগরজীবনে হরহামেশা যেসব ফুল দেখা যায় না শরৎকালে তার দেখা মেলে। একঘেয়ে জীবনে ফুলের উপস্থিতি বাড়িয়ে দেয় সৌন্দর্য, মনটাও থাকে সতেজ। শরতের প্রকৃতির আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো মৃদুমন্দ বাতাসে সবুজ ধানের কচি পাতাগুলো একসঙ্গে দুলতে থাকা। এর সৌন্দর্যও ব্যাখ্যাতীত।

হেমন্তকে বলা হয় ফসলের ঋতু; আর শরৎ হলো ফসল সম্ভাবনার। কৃষিনির্ভর বাংলার বুকে প্রাপ্তির আশা জাগিয়ে তোলে শরৎ। কৃষকরা নবান্নের আশায় দিন গোনেন। কারণ, শরৎকালে মাঠে মাঠে সবুজ ধানের ওপর সোনালি আলোর ঝলমলে রূপ দেখা যায়। দূর্বা ঘাস ভিজে যায় হালকা শিশিরে। চারদিক আমন ধানের সবুজ চারার ওপর ঢেউ খেলে যায় উদাসী হাওয়া। প্রতীক্ষায় থাকে কৃষকরা আসন্ন নবান্নের আশায়। বিলের জলে নক্ষত্রের মতো ফুটে থাকে সাদা ও লাল শাপলা। এ সময় ফল হিসেবে পাওয়া যায় আমলকি, জলপাই, জগডুমুর, তাল, অরবরই, করমচা, চালতা, ডেউয়া ইত্যাদি। আকাশ থেকে কল্পলোকের পরিরা ডানা মেলে নেমে আসে পৃথিবীতে। শরতের দিনরাতের মনকাড়া সৌন্দর্য বাংলার মানুষকে মোহিত করে। এ কারণে বলা যায়, শরৎ বাংলার ঋতুরূপের রাজকুমারী। তবে শরৎ যেন দিন দিন হয়ে উঠছে বইয়ের পাতার বাসিন্দা। নাগরিক জীবন এক অনিশ্চয়তার মধ্যে ছুটছে। যখন রুটি-রুজির সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত মানুষ তখন শরতের অপরূপ বিভা দেখার ফুরসত কোথায়!

লুকোচুরি খেলা বোধহয় শরতের ভীষণপ্রিয়। তাই রোদ আর ছায়ায় মধ্যে লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে সারাদিন। কখনো সাহসী সূর্য দেখায় নিজের তেজ। আবার পরক্ষণেই দলছুট সাদা মেঘ ঢেকে দেয় সূর্যের মুখ। বুক পেতে আলো-আঁধারের এই খেলা উপভোগ করে আসমানি আকাশ। ফসল ভরা ক্ষেতে এসময় দোলা কাটে দখিনা বাতাস। রাতের বেলায় জোছনা জ্বালায় আলোর প্রদীপ। মায়াবী শরৎ তার চঞ্চলতা দিয়ে কেড়ে নেয় প্রকৃতি আর মন।

শরতের রাতে ফোটা শিউলি ফুল ভোরবেলাতেই মিলিয়ে যায়। বলা ভালো ঝরে পড়ে। সবুজ ঘাসের ওপর পড়ে থাকা শিউলি ফুল কুড়িয়ে আনার অপার আনন্দ যে অন্য কিছুতে মেলে না, সেটার এই মজা যে পেয়েছে, সেই জানে। বিশেষ করে বাঙালির কাছে এর যে আবেদন, সেটা বলিউডে তৈরি হওয়া অক্টোবর সিনেমা দেখলে বোঝা যায়। খোদ বলিউডে বসে বাঙালি পরিচালক সুজিত সরকার তাঁর চলচ্চিত্রে শিউলি ফুলের সঙ্গে অক্টোবর মাসকে মিলিয়ে বানিয়েছেন অসাধারণ এক চলচ্চিত্র। জীবনের সঙ্গে প্রকৃতিকে মিলিয়ে দেখার এই দৃষ্টিভঙ্গি হয়ত বাঙালি পরিচালকের পক্ষেই সম্ভব। না দেখা হলে, এই শরতে ঘরে বসেই সিনেমাটি দেখা যেতে পারে।

শরতে নদীর কিনারে বালির চরে হেসে ওঠে কাশবন। শুধু কাশবনই নয়, শরতে ফুলে ফুলে সেজে উঠেছে গোটা প্রকৃতি। এ প্রকৃতিতে শাপলা, শালুক, পদ্ম, জুঁই, কেয়া, কাশফুল, শিউলি, জবা, কামিনি, মালতি, মলিকা, মাধবী, ছাতিম ফুল, বরই ফুল ও দোলনচাঁপা, বেলি, জারুল, নয়নতারা, ধুতরা, ঝিঙে, রাধাচূড়া, স্থলপদ্ম, বোগেনভেলিয়াসহ নানারকমের ফুলে হেসে ওঠে গ্রামবাংলার রূপ।

শরতে কাশফুলের অবারিত স্বাধীনতা, সুনীল আকাশে পেঁজা তুলার মতো আলস্যে ভেসে বেড়ানো মেঘ, পথ হারানো সাদা বকের সারি, মন মাতানো সুখে প্রজাপতি-ফড়িংয়ের ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ নাচানাচি, বাতাসে শিউলির তাজা ঘ্রাণ, ধানক্ষেতে নুয়ে থাকা সোনারঙা শিষ, নদীর পানিতে ভরা জোছনার ছায়া এসবই শরৎ ঋতুর চিরচেনা বৈশিষ্ট্য।

শরৎ মানেই শিউলি ফুলে শীতের ঘ্রাণ। শীতের আগমনি বারতা জানান দেয় ভোরের শিশির। নীল আকাশ। সাদা মেঘের সারি। পাহাড়ের চূড়ার সবুজ ঘাসে টুকরো টুকরো মেঘের আনাগোনা। টলটলে জলে ঢেউয়ের দোলা। পাখির কলরব। পোকামাকড়ের খাবার সংগ্রহের ব্যস্ততা। এসব বলে দেয় এসেছে শরৎ। মনে হয় হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করি শরতের মেঘ। ভেসে যাই নীল মেঘের ভেলায়।

ইমরুল ইউসুফ: উপপরিচালক, বাংলা একাডেমি

বিপ্লবের উজ্জ্বল দীপশিখা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

অনুপ বিশ্বাস

চট্টগ্রামের ধলঘাট গ্রাম। শান্ত এবং সবুজে মোড়া। সেখানে ১৯১১ সালের এক প্রভাতে জন্ম নেন এক কন্যা; যার নাম কেউই তখন কল্পনা করতে পারেনি বাংলার ইতিহাসে একদিন তিনি হয়ে উঠবেন নির্ভীকতা, আদর্শ আর প্রতিজ্ঞার প্রতীক। নাম প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার; এক মহান নারী বিপ্লবী, যিনি ব্রিটিশ শাসনামলে এ বাংলায় স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় প্রথম বাঙালি নারী শহিদ হিসেবে পরিচিত। তিনি আজ শুধু ইতিহাসের পাতায় নয়, সাহসের অভিধানে জ্বলজ্বল করে।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের জন্ম ১৯১১ সালের ৫ই মে চট্টগ্রামের পাতিয়া উপজেলার ধলঘাট গ্রামে এক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারে। বাবা জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দেদার ছিলেন চট্টগ্রাম পৌরসভার হেড ক্লার্ক এবং মা প্রতিভাদেবী ছিলেন গৃহিণী। প্রীতিলতার মা তাঁর শিক্ষাজীবনে ছিলেন বিশেষ উৎসাহদাত্রী। সংসারের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না হলেও পরিবারে শিক্ষার পরিবেশ ছিল উজ্জ্বল।

ছোটোবেলা থেকেই প্রীতিলতা ছিলেন মেধাবী, শান্ত ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি ভর্তি হন চট্টগ্রামের ড. খাস্তগীর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে। এ বিদ্যালয়টি সে সময় মেয়েদের শিক্ষার অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান ছিল। পড়াশোনায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে তিনি বিদ্যালয়ের সবার নজরে আসেন। ১৯২৮ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন, যা সে সময় কোনো মেয়ের জন্য ছিল বিশাল অর্জন। পরিবার, শিক্ষক, সহপাঠীরা সবাই যেন বুঝতে পারছিলেন মেয়েটির পথ অন্যদের থেকে হয়ত একটু আলাদা।

ম্যাট্রিক পাসের পর প্রীতিলতা প্রথমে ঢাকা ইডেন কলেজে ভর্তি হন ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার জন্য। দুই বছর পর তিনি কলকাতার বিখ্যাত বেথুন কলেজে ভর্তি হন এবং দর্শনে স্নাতক (বি.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। স্নাতক পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফলের জন্য তিনি 'ডিস্টিংশন' পান।

পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি নিয়মিত সাহিত্যচর্চা, নাটকে অভিনয় ও সংস্কৃতি চর্চায় যুক্ত ছিলেন। কিন্তু এই সময়েই তাঁর অন্তর জেগে উঠেছিল দেশের জন্য কিছু করার বেদনায়। ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের গল্প এবং বাঙালির আত্মমর্যাদার প্রশ্ন– সবই তাকে ধীরে ধীরে টেনে নেয় বিপ্লবী আন্দোলনের দিকে। ইংরেজদের কঠোর শাসন, বঞ্চনার রাজনীতি, বর্ণবাদী আচরণ– সবই তাকে ভেতরে ভেতরে ব্যথিত করত।

১৯৩০ সালে কলকাতা থেকে ফেরার পর প্রীতিলতা যোগ দেন চট্টগ্রামের অপর্ণাচরণ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে। কিন্তু তাঁর জীবনের মূল স্রোত তখন অন্যদিকে বয়ে যাচ্ছে। দেশে তখন উত্তাল সময়। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আর চট্টগ্রামে মাস্টার দা সূর্যসেনের নেতৃত্বে গড়ে উঠছে বিপ্লবী সংগঠন 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি (চট্টগ্রাম শাখা)'।

সূর্যসেনের নেতৃত্বে পরিচালিত এই সশস্ত্র বিপ্লবী গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয় হয় প্রীতিলতার। তাঁর সাহস, বুদ্ধিমত্তা এবং দৃঢ়সংকল্প দেখে সূর্যসেন দ্রুতই বুঝতে পারেন যে– এই তরুণী কেবল সংগঠনের সদস্যই নন, তিনি হতে পারেন ভবিষ্যতের এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা।

প্রীতিলতাও বুঝলেন, স্বাধীনতার পথে দাঁড়িয়ে শুধু পাঠদান যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন শৃঙ্খল ভাঙার সাহস। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রীতিলতা বিপ্লবী সংগঠনের নানা কাজে যুক্ত হন। কাগজপত্র গোপনে পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে অস্ত্র পরিবহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন– সব ক্ষেত্রেই তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন।

বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে নারীদের সম্পৃক্ত করাকে তখন ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত ভয় পেত। এ কারণেই বিপ্লবীরা নারীদের সামনে এনে প্রতিরোধের নতুন বার্তা দিতে চেয়েছিলেন। দিনে দিনে প্রীতিলতা হয়ে উঠলেন সেই প্রতীক।

ব্রিটিশদের বর্ণবাদী নিপীড়নের সবচেয়ে কুখ্যাত প্রতীক ছিল চট্টগ্রামের পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাব, যার প্রবেশদ্বারে ঝুলত বর্ণবাদী সাইনবোর্ড। এই ক্লাবটিকে ধ্বংস করা ছিল বিপ্লবীদের কাছে এক প্রতীকী কর্মসূচি। ১৯৩২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর মাসে সূর্যসেন সিদ্ধান্ত নেন ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্ব দেবেন একজন নারী; আর সেই দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রীতিলতাকে। তিনি

বিপ্লবী যুবকের একটি দল নিয়ে পরিকল্পনার শেষ প্রস্তুতি নেন।

সেদিন গভীর রাতে বিপ্লবীরা পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাব ঘিরে ফেলে। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রীতিলতার নেতৃত্বে দলটি ক্লাবে বোমা নিক্ষেপ করে। ব্রিটিশ সেনা ও পুলিশ মুহূর্তেই পাল্টা আক্রমণ চালায়। গোলাগুলির ভেতর বিপ্লবীরা কিছুটা ক্ষয়ক্ষতি ঘটাতে সক্ষম হলেও পুরো দল নিরাপদে সরে আসতে পারছিল না। এসময় প্রীতিলতা গুরুতর আহত হন। আহত অবস্থায় ধরা পড়লে তিনি যে নির্মম নির্যাতনের মুখে পড়বেন তা তিনি জানতেন। তাই নিজের কাছে রাখা পটাশিয়াম সায়ানাইড পান করে আত্মহত্যা করেন, যাতে ব্রিটিশরা তাঁকে জীবিত পেয়ে সংগঠনের তথ্য আদায় করতে না পারে। মাত্র ২১ বছর বয়সে রক্তিম ভোরের সঙ্গে মিশে গেল তাঁর জীবন। কিন্তু নিভে গেল না তাঁর আলো। উপমহাদেশের বিপ্লবীরা তাঁকে বলতেন, 'আগুনপাখি'– যে আগুন জ্বলে ওঠে স্বাধীনতার স্বপ্নকে আলোকিত করতে।

ব্রিটিশ সরকার প্রীতিলতার মৃত্যুতে শঙ্কিত হয়ে পড়ে, কারণ একজন নারী সশস্ত্র লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছে– এটি ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের কাছে অপ্রত্যাশিত ও বিপজ্জনক বার্তা। তৎকালীন ভারতবর্ষের সংবাদপত্রগুলোতে তাঁকে নিয়ে প্রকাশিত হয় বিশাল আলোচনা। বাঙালির ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর নাম। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রীতিলতার কাহিনি অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন গবেষণায় বলা হয়েছে, নারী-পুরুষ সমান ত্যাগ স্বীকার করে স্বাধীনতা অর্জনের যে বার্তা আজ দৃশ্যমান, তার পথিকৃৎদের মধ্যে সবচেয়ে সামনের সারিতে ছিলেন প্রীতিলতা।

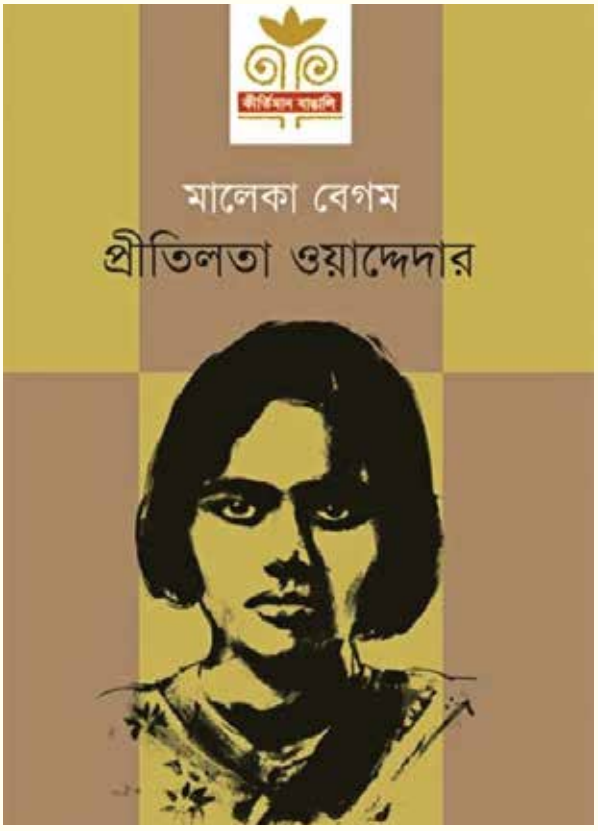

একজন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের জীবন সংগ্রাম আজ আমাদের পথ দেখায়। তিনি দেখিয়েছিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর আত্মত্যাগ প্রমাণ করেছে আদর্শের শক্তি কতটা দুর্জয় হতে পারে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তিনি কেবল এক বিপ্লবী নন– তিনি এক প্রতীক, এক অনুপ্রেরণা, এক চেতনার আলো।

স্বাধীনতা ও ন্যায়বোধের প্রতি অনড় প্রতিজ্ঞা থাকলে সামান্য মানুষও হয়ে উঠতে পারে ইতিহাসের আলোকবর্তিকা। চট্টগ্রামের ধলঘাটের সেই সরল কিশোরী কীভাবে সাহসের দীপ্তি নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন, তার গল্প বাঙালি জাতির আত্মমর্যাদার ইতিহাস হয়ে আছে আজও। প্রীতিলতার ২১ বছরের ক্ষুদ্র জীবন আমাদের বলে– 'স্বাধীনতার স্বপ্নের জন্য যে আগুন জ্বলে, তা কখনো নিভে না'।

অনুপ বিশ্বাস: প্রাবন্ধিক

জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৫

'প্রযুক্তিনির্ভর যুবশক্তি, বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্বের অগ্রগতি'—এই প্রতিপাদ্য নিয়ে উদ্‌যাপিত হয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২৫। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সফল আত্মকর্মী ক্যাটাগরিতে ১২ জন ও যুব সংগঠক ক্যাটাগরিতে ৪ জনসহ মোট ১৬ জনকে প্রদান করা হয় জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৫। ১২ই আগস্ট হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, সাম্য, নাগরিক মর্যাদা, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র ও সমৃদ্ধির নতুন বাংলাদেশ গড়ার যে সুযোগ আমাদের সামনে এসেছে, সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে সবচেয়ে বড়ো অবদান রাখবে দেশের তরুণ প্রজন্ম।

উপদেষ্টা আরো বলেন, তরুণ জনশক্তিই আমাদের দেশের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। সরকার এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে যুব উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, ঋণ ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির নানা কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে।

যুবসমাজের স্বার্থে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ইমপ্যাক্ট প্রকল্প, ভ্রাম্যমাণ আইসিটি প্রশিক্ষণ, ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রকল্প, যানবাহন চালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এছাড়া EARN (Economic Acceleration and Resilience for NEET-Non-education, Employment or Training) প্রকল্পের আওতায় ৯ লাখ যুবক ও যুব নারীকে দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। পাশাপাশি, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণভিত্তিক আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প দ্রুত চালু হতে যাচ্ছে।

প্রতিবেদন: উষা রানী

সাম্প্রতিক নাট্যচর্চায় জুলাই বিপ্লব

আবু সাঈদ তুলু

জুলাই বিপ্লব– বাংলাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। দীর্ঘদিনের ক্ষমতাসীন সরকার যখন ধীরে ধীরে একনায়কতন্ত্র কায়েম, বিরোধী মতকে রুদ্ধ, দমনপীড়ন ও সন্ত্রাসবাদী আচরণের পথ বেছে নিয়েছিল এবং সাধারণের অধিকার ও মেধাকে ছাপিয়ে তাদের কোটাকে প্রধান করে নিজেদেরই ক্ষমতায়ন করছিল সে পটভূমিকাতে কয়েক বছরের অসন্তোষের ধারাবাহিকতায় ২০২৪-এর জুলাই মাসে ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। এসময় ক্ষমতাসীন দল ও সরকারের দমনপীড়নে মাত্র ২১ দিনে ৮৫৮ জনের অধিক শহিদ ও ১১,৫৫১ জনের বেশি আহত হবার ঘটনা ইতিহাসে বিরল। এ মর্মন্তুদ বাস্তবতা নাট্যচর্চায়ও প্রভাব বিস্তার করেছিল। জুলাই বিপ্লবের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করলে এ অভ্যুত্থানকে স্মরণ করতে নাট্য উৎসবের আন্দোলন করা হয়। এতে নতুন নাটক নির্মাণের জন্যও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ বরাদ্দও দেওয়া হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে ৩১শে জুলাই-৮ই আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত 'জুলাই পুনর্জাগরণ নাট্য উৎসব ২০২৫' শিরোনামে আয়োজিত উৎসবে শিল্পকলা একাডেমির জাতীয়নাট্যশালার ২টি মঞ্চে ৯দিনে ১১টি নতুন নাটক পরিবেশিত হয়।

৩১শে জুলাই ২০২৫ বৃহস্পতিবার উৎসবের প্রথমদিন মঞ্চস্থ হয় নায়লা আজাদ নূপুরের পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় নাটক 'রি-রিভোল্ট'। এটি বিপ্লবের মোট ২১ দিনের রাস্তায় বিক্ষোভ ও সহিংসতার দৃশ্যকল্প। হিপহপ র‍্যাপ নৃত্যের আঙ্গিকে বিদ্রোহী রূপে বিপ্লব উপস্থাপিত। হিপহপ এমন এক ধরনের নৃত্য যা নৃত্যের শাস্ত্রীয় কোনো বিধিনিষেধের আওতাধীন নয়। নিজের মতো করে শরীর ভেঙে ও চালনা করে গতিশীল অভিব্যক্তিপূর্ণ ক্রিয়া থাকে এতে। এ নৃত্য সত্তরের দশকে আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটি শহরে উদ্ভব হয়। রাস্তায় প্রতিবাদের ডাক থেকে শুরু হয়ে শেখ হাসিনার পলায়ন পর্যন্ত তুলে ধরা হয়। সংলাপহীন, নৃত্য ও টানটান শারীরিক ভাষা নির্ভর পরিবেশনার গাঁথুনি। কোনো একক চরিত্র বা ঘটনার আলাদা বিকাশ লক্ষ্য করা যায়নি। সামগ্রিকতার মধ্য দিয়ে বিপ্লবকালীন রাস্তার বাস্তবতা তুলে ধরতে চেয়েছেন। নাটকটি দেখাতে চেয়েছে– বিপ্লব মানেই ধ্বংস নয়, সৃষ্টির প্রসববেদনা। অন্য নির্দেশক হয়ত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে জুলাই বিপ্লবকে উপস্থাপনে বাঙালির জাতিগত ও ঐতিহ্যবাহী উপকরণকে বেছে নিতেন। কিন্তু নির্দেশক নায়লা আজাদ হিপহপ ড্যান্স মাধ্যমকে নিরীক্ষা

করতে চেয়েছেন। স্লোগান, টেলিভিশনের নিউজ, সাক্ষাতকার প্রভৃতির ভয়েজওভার, সাংগীতক শব্দ-নিনাদে ব্যস্ত হয়ে ওঠেছিল মঞ্চ।

'শুভঙ্কর হাত ধরতে চেয়েছিল' নাটকটি নির্মিত হয়েছে আবু সাঈদ শহিদ হবার প্রেরণা থেকে। রচনা ও নির্দেশনা দিয়েছেন দীপক সুমন। দেড় ঘণ্টাধিক ব্যাপ্তির এ নাটকটি হল ভর্তি দর্শক পিনপতন নীরবতায় উপভোগ করে। রোমান্সের সঙ্গে জুলাইয়ের সংগ্রাম যেন এক হয়ে গিয়েছিল। পাবর্তীপুর স্টেশনে একটি মেয়ে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে। মেয়েটি সহযাত্রী শুভঙ্করের মাধ্যমে জানতে পারে বুর্জোয়া শ্রেণি কর্তৃক শ্রমিকদের ওপর নির্যাতনে প্রাবল্য। আধিপত্যবাদী সরকার সাধারণ মানুষের অধিকারকে খর্ব করছিল। মেধাবীকে অবহেলা করে নিজেদের ক্ষমতাকে কোটার নামে সংরক্ষিত করছিল। জুলাইয়ের সে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শুভঙ্করকে নামতে হয়েছিল রাজপথে। মেধাকে আশ্রয় করেই যে শুভঙ্করের প্রতিষ্ঠিত হবার কথা। কিন্তু ২০২৪-এর বিপ্লবে পিতৃহীন শুভঙ্কর গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। ট্রেনের জন্য অপেক্ষমান মেয়েটির হাত ধরা তার হয়ে উঠেনি। কিন্তু প্রতিবাদের স্লোগান ছড়িয়ে পড়েছিল মানুষের হাতে হাতে। তীরন্দাজের এ নাটকটি প্রসেনিয়াম ধারায় উপস্থাপিত। দুটো চরিত্র প্রধান। সংলাপ নির্ভর। ফ্ল্যাশব্যাকেই কাহিনির প্রবহমানতা। নাটকের দলের রিহার্সেলকে কেন্দ্র করে গল্পের সিংহভাগ আবর্তিত। সে পরিপ্রেক্ষিতে কিছু চরিত্রের পোশাক সাজেস্টিক করা হয়েছে। সাজেস্টিক উপকরণে মঞ্চও সাজানো হয়েছে। নবম-দশম শ্রেণিতে পড়ুয়া অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

জুলাই বিপ্লব নিয়ে নির্মিত আরেকটি নাটক 'দেয়াল সব জানে'। রচনা ও নির্দেশনায় ছিলেন শাকিল আহমেদ সনেট। কর্তৃত্ববাদী সরকারের বৈষম্যনীতি, অত্যাচার ও দমনপীড়নের রাজস্বাক্ষী যেন সাধারণ মানুষের অগোচরেই বিরাজমান। কিন্তু তা সরকার জানে না। নাটকটিতে একক ঘটনার প্রবহ নিয়ে রচিত নয়। জুলাই বিপ্লবের মৃত্যুমুখী নানা ঘটনার সমন্বিত উপস্থাপনা। শুরুতেই মঞ্চে অনেকগুলো কফিন। লাশগুলো একে একে উঠে আসে। বর্ণনা করতে থাকে তার মৃত্যুকাহিনি। রিকশাচালক রহিমুদ্দিনের মৃত্যু অনাকঙ্ক্ষিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র নাজিম অধিকার আদায়ের স্বপ্নে রাজপথে নেমেছিল। কিন্তু অধিকার কী আদায় হয়েছিল? নাজিম জানে না। পুলিশের গুলিতে বুকটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। গার্মেন্টসকর্মী আসমার ক্লান্ত শরীর নেতিয়ে পড়েছিল রাস্তায়। আর শিশু নাইমের উড়তে চাওয়া খেলনা যেন হেলিকপ্টারের ছিন্নপাখা হয়ে মৃত্যুর দিকে নিয়ে গিয়েছিল। আর স্তূপে স্তূপে পড়ে থাকা হাসপাতালের করিডোরে নিথর শয্যায় শায়িত আন্দোলনকারীরা যেন তখনো স্বপ্ন দেখে। এতো নির্মমতা এতো অত্যাচার কী গোপন থাকে। ইতিহাসের সত্যকে নিশ্চিহ্ন করা যায় না। দেয়ালই সব মনে রাখে। প্রতীকী নানা ব্যঞ্জনায় ফুটে ওঠেছে জুলাই

গণ-অভ্যুত্থানের নির্মম বাস্তবতা। তবুও সময় থেমে থাকে না। নাটকের প্রতিটি প্রতীক, প্রতিটি সংলাপ, প্রতিটি দৃশ্য ইমেজের সাথে আলো-শব্দ-সংগীতের অপূর্ব সমন্বয়ের দর্শকের হৃদয়ের গভীর অনুভূতিতে নাটকটি স্পর্শ করে।

অন্যদিকে জুলাই বিপ্লব নিয়ে নির্মিত 'দ্রোহের রক্ত কদম' নাটকে ফুটে উঠেছে নিপীড়নের ভাষা। রচনা ও নির্দেশনা : ইরা আহমেদ। নাটকটি শরীরের ভাষা নির্ভর সাইসেন্স অ্যাকটিং। মঞ্চে সারাক্ষণ শারীরিক কসরত, ইউরোপীয় মিউজিক ও ইংরেজি ভাষ্য ব্যবহার হয়েছে। শোষিতের প্রতি শোষকের নিপীড়ন কত ভয়ংকর হতে পারে তারই ইঙ্গিত। তবে উপস্থিত দর্শকের অধিকাংশই ফিজিক্যাল অ্যাকটিং নির্ভর এ নাটকটি গ্রহণ করতে পারেননি। পরিবেশনাটির শুরু থেকে মঞ্চের একপাশে দাবার রাজা-মন্ত্রী ও অন্যপাশে জাল ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। ভিডিওগ্রাফির প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নিপীড়নকে দেখাতে চেয়েছেন।

নির্দেশক বলেন, 'দ্রোহের রক্ত কদম' কেবল একটি নাটক নয়, প্রযোজনাটি প্রচলিত সমাজব্যবস্থার একটি রূপ তুলে ধরে। যেখানে রাষ্ট্র ও সমাজের অন্তর্নিহিত অসাম্য, বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং মানুষের মধ্যেকার এক বিকৃত প্রতিযোগিতাকে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে সংলাপের চেয়ে অধিকতর বলিষ্ঠ এক মাধ্যম শরীরের ভাষা। এখানে সংলাপ নয়, দেহ কথা বলে। প্রতিটি ভঙ্গিমা, প্রতিটি নৈঃশব্দ্য একেকটি হাহাকার।

জুলাই বিপ্লব নির্ভর আরেকটি অনবদ্য নাটক ছিল '৪০৪ : নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি'। নাটকটির রচনা ও নির্দেশনা – লাহুল মিয়া। প্রসেনিয়াম মঞ্চধারায় দর্শকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া নির্ভর নাটক। ব্রেখটীয় এলিনিয়েশনের মোহবিষ্টতার বিপরীতে দর্শকের অনুভূতির সঙ্গে একধরনের বোঝাপড়া। কিছু নাট্যকর্মী মঞ্চে কিছু একটা করতে চায়। কিন্তু কী করবে? এমনই পর্যায় থেকে নাটকটি শুরু হয়। তাদের সিদ্ধান্ত পাল্টে যায়- তারা নাটক করবে না। কারণ বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় তারা উদ্বিগ্ন-অস্থির, মানসিক বিক্ষুব্ধ। তাহলে তারা কী করবে? এমন সময় মঞ্চে উপস্থিত হয় ফ্যাসিবাদী বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী প্রতীক- হিটলার। ফ্যাসিবাদী প্রতীকী চরিত্রটি যখন হাতে বিশ্বের মানচিত্র ঘুরাতে ঘুরাতে মঞ্চে আসেন তখন আর প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝতে বাকি থাকে না কারো। আবার সিদ্ধান্ত পাল্টে। শুরু হয় টক শো। হ্যাঁ একজন সরকারি দলের নেতা ও আরেকজন বিরোধী দলীয় নেতার টক শো। সংযাত্রার ফুটে উঠতে থাকে অন্তঃসারশূন্য রাজনীতি ও দেশের করুণ বাস্তবতা। এমন সময় মঞ্চে উঠে আসে জুলাই বিপ্লবে তুর্যের রাস্তায় নামার গল্প। বাবা-মার আদরের সন্তান

যখন শুনতে পায় অন্য ছাত্রকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করেছে। তখন বাবা-মার আপত্তি সত্ত্বেও সে নেমে পড়ে রাজপথে। এভাবেই প্রতিবাদী ভাষা মঞ্চরূপ লাভ করে।

উৎসবে জর্জ অরওয়েল-এর উপন্যাস অবলম্বনে 'এনিমেল ফার্ম' নাটকটি বেশ আলোচিত হয়ে ওঠে। নির্দেশনা দিয়েছেন ড.

সাইদুর রহমান লিপন। বিশ্বে যেসময় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সবচেয়ে পবিত্র বলে মনে করা হতো সেসময় বিপ্লবের অন্তঃসারশূন্যতা ও করণকৌশলের নেতিবাচক দিকগুলো ব্যঙ্গ-বিদ্রোহের ছলে রূপকাশ্রিতভাবে 'এনিমেল ফার্ম' উপন্যাসটি দেখিয়েছে। এ উপন্যাসটিতে প্রতীকী ভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতন্ত্রী সরকার ও তাদের শাসন প্রক্রিয়ায় নিপীড়ন, নির্যাতন, শোষণ-পীড়ন ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক ধারার তীব্র সমালোচনা করেছেন। উপন্যাসের গল্পটি একটি পশুর খামারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও আধিপত্য ও ক্ষমতার লড়াইয়ে মানুষের দাসত্বের স্বরূপই উন্মোচিত করে।

নাটকটির গল্প শুরু হয় ম্যানোর ফার্মের পশুদের সংগঠিত হবার মধ্য দিয়ে। যেখানে পশুদের দুঃখ-দুর্দশা ও দাসত্ব নিত্যসঙ্গী। এ ফার্মের মালিক কোনো কষ্ট না করেই ফল ভোগ করে। এ সকল প্রাণিকুলের প্রভু সেজে বসে আছে। তাই এই দুপেয়ের দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রয়োজন, সবাই সংগঠিত হতে থাকে। তবে বিপ্লবের প্রথম দিকে অনেকেই রাজি হয়নি। যেমন ঘোটকী মলি–

মলি– বিদ্রোহের পরেও নিয়মিত চিনি পাওয়া যাবে? ... আমি কি এখনকার মতো ফিতে পরতে পারবো আমার কেশরে?

স্নোবল : যে ফিতের জন্য তুমি এত পাগল, সেগুলো যে দাসত্বের পরিচায়ক– সেটা জানো? তুমি বুঝতে পারছ না, ওই ফিতেগুলোর চেয়ে স্বাধীনতার মূল্য কত বেশি? নির্দেশক মূলগল্পের গাঁথুনি ও চরিত্রকে অক্ষুণ্ন রেখে বিপ্লবোত্তর সমস্যাগুলোকে দেখাতে চেয়েছেন। প্রসেনিয়াম ধারায় দেড় ঘণ্টার টানটান শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশনা। প্রায় প্রত্যেকেরই অসাধারণ মেধাদীপ্ত অভিনয়। চরিত্রের হাবভাব ও সংলাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। নাট্যদৃশ্যে চরিত্র ও চরিত্রের সংলাপের অ্যামফেসিসগুলো খুব নান্দনিক।

জুলাই বিপ্লবকে উপজীব্য করে জহির রায়হানের উপন্যাস অবলম্বনে খন্দকার রাকিবুল হক নির্মাণ করেছেন 'আর কত দিন'। এ নাটক শুরু হয় একদল মানুষের অনিশ্চিত যাত্রা দিয়ে–'তবু মানুষের এই দীনতার বুঝি শেষ নেই। শেষ নেই মৃত্যুরও। তবু মানুষ মানুষকে হত্যা করে। ধর্মের নামে। বর্ণের নামে। জাতীয়তার নামে। সংস্কৃতির নামে।' নাটকটি অবরুদ্ধ ও পদদলিত মানুষের প্রতিবাদ। পাশবিকতা ও ভীতি সন্ত্রস্ততায় মানুষের যাত্রা শুরু হয়ে ধীরে ধীরে গল্পে উঠে আসে বুড়ি মা, ইভা, তপু চরিত্র। এ উপন্যাসে কোনো স্থানের উল্লেখ নেই।

প্রতীকীভাবে মানবতাহীন বিধ্বস্ত জনসমষ্টিকে ইঙ্গিত করেছেন। চিত্রকল্পের ঢঙে নানা ছোটো ছোটো ঘটনা ফুটে ওঠেছে। বর্ণনার ঢঙে ফুটে উঠেছে বিশ্বের হিংস্র মানসিকতার প্রেক্ষাপট। এমনকি বর্ণবাদও। তারপরও ঔপন্যাসিক জহির রায়হান তপু ও ইভা চরিত্রের মধ্য দিয়ে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখেছেন।

অপরদিকে ইলিয়াস নবী ফয়সাল রচিত ও নির্দেশিত 'অগ্নি শ্রাবণ' নাটকে প্রতীকীভাবে দেখানো হয় ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকারের বীভৎসতা। এটি গীত-নৃত্য নির্ভর প্রতীকী নাটক। নাটকে পাখিদের রাজা বেজায় কুশলী। নিজের ক্ষমতা বজায় রাখতে উন্নয়নের নামে চোখ ধাঁধানো সব কাজ করেন। পাখিদের কাঠালের রেসিপি দেন, প্লাস্টিকের গাছ স্থাপন করেন। তার সভাসদরাও নিজেদের স্বার্থ ভরতে নানা কুশলী আচরণ করে থাকে। শেষে ঘটে ট্রাজিক পরিণতি। ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যের আদলে চর্তুদিকে দর্শকবেষ্টিত মঞ্চ, বর্ণনা, চলনবিন্যাস, গীতলাস্য পরিবেশনা। থ্রু লাইনের টানটান উত্তেজনায় মন্ত্রমুগ্ধের মতো দর্শক উন্মুখ হয়ে উপভোগ করেছে। নাটকের চরিত্রগুলো প্রতীকী। কোথাও তাদের নাম নেই। কিন্তু শেখ হাসিনা ও তার মন্ত্রীপরিষদের ওবায়দুল কাদের, আসাদুজ্জামান খানকে চিনতে কোনো দর্শকের বেগ পেতে হয় না। আন্দোলনকারী তরুণ প্রজন্মকে সাধারণ পাখির প্রতীকে তুলে ধরা হয়েছে। নির্দেশক ইলিয়াস নবী ফয়সাল সামগ্রিক উপস্থাপনায় জুলাইয়ের নাট্যভাষাই নির্মাণ করতে সচেষ্ট ছিলেন।

নির্দেশক বলেন– 'অগ্নিশ্রাবণ' একটি ঐতিহাসিক উপাখ্যান, যেখানে ক্ষমতার পালাবদলে সাধারণ মানুষের ভাগ্যে আসে না কোনো পরিবর্তন। স্বৈরশাসক বিদায় নেয়, আসে নতুন শাসক- কিন্তু থেকে যায় নিপীড়নের কণ্ঠস্বর, ক্ষোভের শব্দ আর দীর্ঘশ্বাসের ধোঁয়া। ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর, চক্রবদ্ধ পুনরাবৃত্তির বিপরীতে যে সাহসী কণ্ঠস্বরই উঠে দাঁড়ায়- 'সেই কণ্ঠস্বরই এই নাটকের মূলসুর।'

ধীমান চন্দ্র বর্মনের 'মুখোমুখি' নাটকটি জুলাইয়ের গণহত্যা নিয়ে। পরিবেশনায় থিয়েটার ওয়েব। চারদিকে দর্শকবেষ্টিত মঞ্চ। শুরুতে দেখা যায় অন্ধকারে লাশ ফেলা হচ্ছে। ডোমকে তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য তাগাদা দিচ্ছে। সবার মধ্যে আতঙ্ক। এ গণকবরে যেন মৃত্যুর মিছিল। শেষ পর্যন্ত মৃত মানুষেরাও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের স্বনামধন্য নাট্যদল প্রাচ্যনাট্য নির্মাণ করেছে বের্টোল্ট ব্রেখ্টের 'দ্য এক্সপেশন অ্যান্ড দ্য রুল' অনুসারে 'ব্যতিক্রম ও নিয়ম' নাটক। নাটকটি শহীদুল মামুনের অনুবাদে নির্দেশনা দিয়েছেন আজাদ আবুল কালাম। নাটকটি বুর্জোয়া শ্রেণির চরিত্র ও সমাজব্যবস্থার স্বরূপ উপলব্ধির নিরীক্ষা। এক ব্যবসায়ী একজন কুলি ও গাইড নিয়ে ব্যবসার জন্য রওনা দেয় বাহারস্থানের উদ্দেশ্য। যেখানে তেলের খনি আছে। যাত্রাপথে

গাইড ও কুলির উপর অত্যাচার করতে থাকে। এতদিন এতভাবে অত্যাচার করতে থাকে যে, পরে আর নির্যাতিতকে বিশ্বাস করতে পারে না। একসময় ব্যবসায়ীর পানির পিপাসা পায়। কুলি পানির পাত্র এগিয়ে দেয়। কিন্তু কুলির পানি দেওয়াকে সে বিশ্বাস করতে পারে না। পানির পাত্রকে তার পাথর বলে মনে হয়। তাই তৎক্ষণাৎ কুলিকে গুলি করে হত্যা করে। আদালতে বিচার

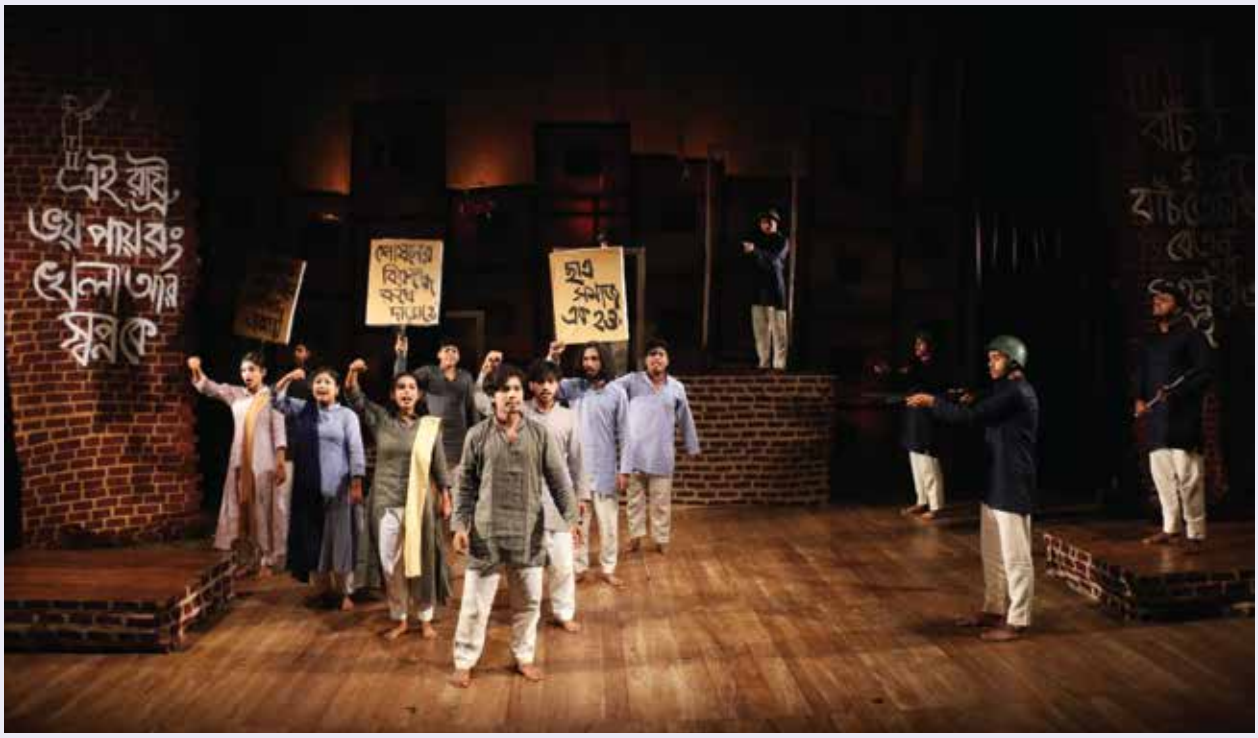

গড়ালে কুলি একজন তৃতীয় শ্রেণির মানুষ ও শ্রমিক, অপরপক্ষে একজন ব্যবসায়ী আত্মরক্ষায় তা করতেই পারে বলে বেকসুর খালাস পায়।

নাটকটি দর্শকবেষ্টিত মধ্যমঞ্চে উপস্থাপিত হয়। মঞ্চের একপাশে সংগীত দল। মিউজিক বাজছে। শুরুর ঘণ্টা বাজলে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মধ্যমঞ্চে গান গাইতে গাইতে হাঁটতে থাকে। গান ও সংগীতের অর্কেস্টা থামতেই শুরু হয় সংলাপ। রাস্তার সাজেশনে সমস্ত নাট্যক্রিয়া মধ্যমঞ্চেই সংঘটিত হয়। শুধু বিচারের দৃশ্যে এপাশে উঁচুতে তিনজন বিচারকের আসন দেখা যায়। নাটকে সংগীত, সংলাপ, অভিনয় ও চলন বিন্যাসে অনবদ্য। উৎসবের সমাপনী দিনে উপস্থাপন হয় 'আগুনি' নাটক। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের ছায়া অনুসরণে ফ্যাসিবাদী রাজার নিপীড়ন-নির্যাতন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নাটক 'আগুনি'। প্রসেনিয়াম মঞ্চবিন্যাসে পাপেট, স্যাডো, ভিড়িও, মিউজিক, নৃত্য-গীত-অভিনয়, কোরিওগ্রাফি ইত্যাদি নানা কলাবিদ্যার সমন্বিত প্রয়োগে নাট্যটি উপস্থাপিত। শুরুতেই মঞ্চে আসে নন্দিনী। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যের কণ্ঠস্বর যে নন্দিনীর। শিশুর আর্তনাদ, কৃষকের কান্না, শোষণ-নিপীড়ন ও সমাজের অজ্ঞতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সে খুঁজে আলোর পথ। নাটকটির পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় ছিলেন কাজী নওশাবা আহমেদ।

বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে উপজীব্য 'মনসুন রেভ্যুলেশন স্পিরিট' কর্মসূচির আওতায় উপরোক্ত প্রতিটি নাট্য নির্মাণের জন্য ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) করে টাকা অনুদান দিয়েছেন। পরে উৎসবে পরিবেশনার সম্মানিও সরকার বহন করেছে। তবে, এসব নাটক নির্মাতা সংস্থাগুলোর মধ্যে 'টিমকালারস', 'এথেরা', 'ফোর্থওয়াল থিয়েটার', 'থিয়েটার ওয়েভ', 'টুগেদার উই ক্যান' ইত্যাদি। প্রযোজন ঐতিহ্যবাহী জাতীয় রীতির ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ। বাংলাদেশে ঐতিহ্যবাহী ধারার কোনো মঞ্চ নেই। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে যা আছে তা সবই ইউরোপীয় আদলের প্রসেনিয়াম নাট্যমঞ্চ। দেশজ ধারার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত চারদিকে দর্শকবেষ্টিত 'জাতীয় বাংলা নাট্যমঞ্চ' তৈরি করা জরুরি। যেখানে পালা, জারি, যাত্রা নিরীক্ষার ক্ষেত্র হয়ে উঠবে। আরেকটি বিষয় বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে বড়ো ধরনের বিরোধ বিদ্যমান। এজন্য সংস্কৃতিচর্চা অনেকটা জনবিচ্ছিন্ন। তাই সভা সেমিনার কিংবা ভিন্ন কোনো কৌশলে 'সবার জন্য সংস্কৃতি' ধারায় এগিয়ে যাওয়া উচিত। যা হোক, এ নাটকগুলোতে দর্শকের উপস্থিতি ছিল অভূতপূর্ব। প্রায় প্রতিদিনই মঞ্চ ছিল দর্শকপূর্ণ। শিশু-কিশোর থেকে বয়োবৃদ্ধ, নানা পেশাজীবীর মানুষ এসেছে। হল ভর্তি নতুন দর্শক, নতুন অভিনেতা, নতুন নাটক, নতুন কোলাহল। কী এক অপূর্ব পরিবেশ। প্রযোজনা ও উৎসব সূত্রে প্রায় ৩০০-এর অধিক কলাকুশলী যুক্ত ছিল। গত ত্রিশ বছরে নাটকে যাদের প্রতিদিন দেখা গেছে এ উৎসবে তাদের কাউকে দেখা যায়নি। প্রায় সবই নতুন। মনে হয়েছে নতুন প্রজন্মই হয়ে উঠছে জাতির বহমান উত্তরসূরি।

আবু সাঈদ তুলু: গবেষক, শিক্ষক ও নাট্য বিশ্লেষক

প্লাস্টিক দূষণ ও নগর জীবনের সংকট

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

ঢাকার রাস্তায় হাঁটলেই চোখে পড়ে প্লাস্টিকের বোতল, পলিথিন, খাবারের মোড়ক আর নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ। এই জিনিসগুলোতে উপকার হলেও আজ সেগুলোই শহরের জন্য সবচেয়ে বড়ো বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের নগরজীবনে প্লাস্টিক এখন যেন নীরব এক দানব– যাকে আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করি। অথচ যার ক্ষতি প্রতিদিন আমাদের ঘিরে ধরছে।

প্লাস্টিকের জনপ্রিয়তার কারণ রয়েছে অনেক। এটি হালকা, টেকসই, সস্তা, সহজে বহনযোগ্য ও সহজলভ্য। পানি, খাবার, পোশাক থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিকস– সর্বত্র প্লাস্টিকের উপস্থিতি রয়েছে। কিন্তু এই সুবিধার পেছনেই লুকিয়ে আছে ভয়াবহ এক বাস্তবতা। প্লাস্টিক মাটিতে বা পানিতে পঁচে না; এটি শত শত বছর টিকে থাকে। ফলে শহরের ড্রেন, নদী, খাল– সবকিছুতেই জমে থাকে অগণিত প্লাস্টিক বর্জ্য। একটি সাধারণ পলিথিন ব্যাগ নষ্ট হতে সময় লাগে প্রায় ৪০০ বছর! ভাবা যায়?

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা বা রাজশাহীর মতো বড়ো বড়ো শহরগুলো এখন প্লাস্টিক বর্জ্যে ভরপুর। ড্রেন বন্ধ হয়ে জলাবদ্ধতা তৈরি হচ্ছে। বর্জ্য পুড়িয়ে ফেলার সময় বিষাক্ত গ্যাসে দূষিত হচ্ছে বায়ু। নদীতে ফেলা প্লাস্টিক আবার মাছের পেটে, আর শেষে মানুষের শরীরে ফিরে আসছে 'মাইক্রোপ্লাস্টিক' হয়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিন ঢাকায় গড়ে ৬০০ টনেরও বেশি প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এর বেশির ভাগই পুনর্ব্যবহারযোগ্য হলেও যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে তা নষ্ট হয়, জমে থাকে মাটির নীচে বা পানিতে ভেসে বেড়ায়।

প্লাস্টিক দূষণের মূল কারণ কেবল ব্যবহারে নয়, এর ব্যবস্থাপনাতেও। আমরা এখনও বর্জ্য আলাদা করে ফেলি না, পুনর্ব্যবহারের সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি এখনো। তাছাড়া, বাজারে পলিথিন নিষিদ্ধ থাকলেও অবৈধভাবে কারখানাগুলো এখনও তা উৎপাদন করছে।

প্লাস্টিকের বিকল্প নেই– এটা বলা ভুল। বরং এর বিকল্প তৈরি করাই এখন সময়ের দাবি। বাংলাদেশে অনেক তরুণ উদ্যোক্তা ও গবেষক এখন কাজ করছেন জৈবভিত্তিক প্যাকেজিং, বাঁশ বা কলাগাছের আঁশ দিয়ে তৈরি ব্যাগ এবং বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক নিয়ে। এছাড়া নাগরিক পর্যায়ে সচেতনতা বাড়ানো, আলাদা বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা এবং কঠোর আইন প্রয়োগ– এই তিনটি বিষয়েই এখন জোর দেওয়া প্রয়োজন। একজন পরিবেশকর্মীর কথায়– আমরা প্রতিদিন প্লাস্টিক ব্যবহার করে নিজেদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করছি; এখন সময় এসেছে ব্যবহারের বদলে দায়িত্ব নেওয়ার।

প্লাস্টিক দূষণ রোধে নাগরিকদের করণীয়:

কেনাকাটায় কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করা, একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক পণ্য পরিহার করা, বর্জ্য আলাদা করে ফেলা, শিশু ও কিশোরদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা তৈরি করা। ছোটো ছোটো এই পরিবর্তনগুলোই বড়ো পরিবর্তনের সূচনা আনতে পারে।

প্লাস্টিক দূষণ শুধু পরিবেশের নয়, মানুষের অস্তিত্বের সংকট। শহর যত আধুনিক হচ্ছে, প্লাস্টিক ততই আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে নীরবে, কিন্তু মারাত্মকভাবে। সময় এসেছে সুবিধা নয়, টেকসই ভবিষ্যৎ বেছে নেওয়ার। নগরজীবনের প্রতিটি মানুষ যদি একটু সচেতন হয়, তাহলে হয়ত একদিন আমাদের শহরও শ্বাস নিতে পারবে আবার– স্বচ্ছ বাতাসে; প্লাস্টিকের ছোঁয়া ছাড়া।

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি: প্রুফ রিডার, নবারুণ, ডিএফপি

নদী মাতা যাহার

সেলিম আউয়াল

নদীমাতৃক দেশ, শব্দটির সাথে আমরা খুবই পরিচিত। পড়ুয়া লোক আবার অনেক অপড়ুয়া লোক অবলীলায় ব্যবহার করে শব্দটি। অনেকে হয়ত আভিধানিক অর্থ জানে না, কেউবা জানে। বাংলা একাডেমির অভিধানে 'নদীমাতৃক' শব্দের অর্থ হচ্ছে, '(যে দেশকে) নদী মাতার মতো লালন করে এমন'। অর্থাৎ নদী মাতা যাহার। শব্দটি আমরা ব্যবহার করি বাংলাদেশ বুঝাতে। বাংলাদেশ হচ্ছে নদীমাতৃক দেশ। একদিন এই এলাকা ছিল সাগর। তারপর হাজার হাজার বছর ধরে নদীর স্রোতের সাথে বয়ে আসা পলিতে গড়ে উঠেছে পলি মাটির বাংলাদেশ। তিন কোণা মাত্রাহীন 'ব' আকৃতির দেশটাকে পণ্ডিতেরা বলেন 'বদ্বীপের দেশ'। বাংলাদেশ নামের নদীবাহিত পলি মাটির এই বদ্বীপটি পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম বদ্বীপ।

নদীর কারণে জন্ম আমাদের এই দেশের। আবার সারা দেশজুড়ে ছড়িয়ে আছে নদী আর নদী, শরীরের শিরা উপশিরার মতো।

নদী তাই বাংলাদেশের মানুষের জীবনের সাথে নানাভাবে জড়িয়ে। নদ-নদীই বাংলাদেশের জীবন, সবুজ-শ্যামল প্রান্তর গড়ে উঠার চাবিকাঠি। নদী ছাড়া বাংলাদেশ ভাবাই যায় না। নদী মানুষকে জল দেয়, নদীর জলে ফসল হয় সজীব। নদীর জলে মাছ, বাংলাদেশে মাছ শিকারের শতকরা ২৭ ভাগ নদী ও খাল থেকে সংগৃহীত হয় এবং এই মাছ ধরাকে রুজিরোজগারের অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে একটি সম্প্রদায়—ধীবর সম্প্রদায়। নদী দিয়ে যোগাযোগ আরো কত কি! এই নদী দিয়েই এদেশের নানা স্থান ঘুরে বেড়িয়েছেন হিউয়েন সাং, ইবনে বতুতার মতো বিশ্বখ্যাত পর্যটকেরা। নদীর তীরেই সেই প্রাচীনকাল থেকে গড়ে উঠেছে শহর-বন্দর-গঞ্জ। বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রভূমিগুলো যেমন—নওগাঁর পাহাড়পুর, বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়, কুমিল্লা জেলার লালমাই-ময়নামতি এবং নরসিংদী জেলার উয়ারী-বটেশ্বর ইত্যাদি নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা গড়ে উঠেছে বুড়িগঙ্গার তীরে, বাণিজ্যিক শহর চট্টগ্রাম গড়ে উঠেছে কর্ণফুলি নদীকে ঘিরে। এজন্যেই সিলেটের একজন শিল্পী নিজের জেলার পরিচয় দিতে গেয়ে উঠেন— 'সুরমা নদীর তীরে আমার ঠিকানারে, বাবা শাহজালালের দেশ সিলেট ভূমিরে...।'

বাংলাদেশের মানুষের অনুভবে-ভালোবাসায় আনন্দ-বেদনায় জড়িয়ে আছে নদী। তাই নদী নিয়ে মানুষ গান লেখে, নদী নিয়ে লেখে কবিতা। নদীর জন্যে ভালোবাসার চিহ্ন পাওয়া যায়, হাজার বছর আগের চর্যাপদের কবির পদাবলি'তে। চর্যার ১৪ নম্বর পদে দেখা যায়, গঙ্গা-যমুনার মাঝখানে নৌকা বাওয়ার ছবি। পুরো পদটিতেই নদীর জলে নৌকা চালানোর দৃশ্য ফুটে উঠেছে। এমনকি নদীপদে যাওয়ার সময় নৌকায় ডাকাত ঝাঁপিয়ে পড়ার কথাও এসেছে। চর্যাপদের কবি বলেছেন—

গঙ্গা উজনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ/
তহি বুড়িলী মাতঙ্গী পোইআ লীলে পার করেই॥
[ভাবানুবাদ: গঙ্গা যমুনার মাঝে রে বেয়ে যায় নৌকা।
'মগ্ন মাতঙ্গী সেখানে লীলাই পুত্রকে পার করে॥]

মৈমনসিংহ-গীতিকায় মহুয়ার পালায় যে রোমান্স দেখা যায়, তা-ও নদীকেন্দ্রীক—'লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর।/গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর॥/ 'কোথা পাব কলসী

কইন্যা কোথায় পাব দড়ি।/তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি॥'

কবি রবীন্দ্রনাথ, পদ্মায় বোটের মধ্যে যিনি দিনের পর দিন কাটিয়েছেন। তার কবিতা-গান-গল্প-উপন্যাসে নদীর কথা এসেছে। 'পদ্মা' কবিতায় তিনি লিখেছেন–' হে পদ্মা আমার,/ তোমায় আমায় দেখা শতবার।/একদিন জনহীন তোমার পুলিনে,/ গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে,/সাক্ষী করি পশ্চিমের সূর্য অস্তমান, / তোমারে সঁপিয়াছিনু আমার পরাণ।'

প্রমত্ত নদীর মতো যার জীবন, সেই কবি, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল লেখেন-'পদ্মার ঢেউ রে মোর শূণ্য হৃদয়পদ্ম নিয়ে যা, যা রে। এই পদ্মে ছিল রে যার রাঙ্গা পা, আমি হারিয়েছি তারে...।'

কপোতাক্ষ নামে যশোরে বয়ে যাওয়া নদীটি একটি মরা নদী। মানুষের জীবনের আর কতটুকুন কাজে লাগে নদীটি এখন। কিন্তু বাংলাভাষী মানুষের হৃদয়ে নদীটির কথা গেঁথে আছে, মাইকেল মধুসূদনের ভাষায়-'সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে/সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে...।'

শৈশব-কৈশোরের কতো নস্টালজিক স্মৃতি নদী নিয়ে। নদী দিয়ে ছুটে চলা নৌকায় চোখ রেখে কলসিকাখে নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে পল্লি বধুর চোখ যায় ভিজে, কারণ এই নদী দিয়ে এইসব নাও তার বাপের দেশে যায়, শৈশব-কৈশোরের মৌ মৌ আনন্দের দিন কেটেছে যেখানে তার। নদীর জলে ঝাঁপ দিতে দিতে চোখ লাল করে বাড়ি ফিরে মায়ের বকুনি খাওয়া, নদীর জলের সুস্বাদু মাছ নিয়ে বাড়ি ফেরা, কত শত স্মৃতি এই নদী নিয়ে।

নদীর নামকরণের বিষয়টিও চমকপ্রদ। আন্তর্জাতিক নদীর একেক দেশে একেক নাম। মানস সরোবরের কাছে আসামের যে ব্রহ্মপুত্র নদ-তিব্বতে তারই নাম সাংপো, অরুণাচলে সে নাম ধারণ করেছে ডিহং, কিন্তু বাংলাদেশে সেই নদীর নাম আরেক রূপ; নাম তার ব্রহ্মপুত্র বা যমুনা। নদ-নদীর সম্পদ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ মানুষেরা ভালোবেসে নানা নামে আখ্যায়িত করেছে নদীকে। এজন্যেই কোনো কোনো নদীর নাম মনে হয় একটি কবিতার শিরোনাম-মধুমতী (নড়াইল-বাগেরহাট), নীলকমল (পশুর নদীর পশ্চিম পারে প্রবাহিত)। এদেশের মানুষ নদীর নাম রেখেছে

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়/হয়তো মানুষ নয়-হয়তো শংখচিল শালিখের বেশে/হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে...।' জীবনানন্দের কবিতায় তার ধানসিঁড়ি নদীটি বার বার ফিরে এসেছে। ধানসিঁড়ি নদীটি হলো তার জনম-মাটির প্রতি, মুগ্ধ করা প্রকৃতির প্রতি তার ভালোবাসার স্মারক।

সিলেটের কবি দিলওয়ারের জন্ম সুরমা নদীর পারের ভার্থখলা গ্রামে। তিনি তার প্রিয় নদী নিয়ে লিখেছেন-'নীচে জল কলকল বেগবতী নদী সুরমার/কান পেতে শুনি সেই অপরূপ তটিনীর ভাষা/গতিবন্ত প্রাণ যার জীবনের সেই শ্রেয় আশা/সৃষ্টির পলিতে সেই বীজ বোনে অক্ষয় প্রজ্ঞার।'

নদী বাংলার মানুষের জীবনের প্রধান অনুষঙ্গ। তাদের গানেও বার বার এসেছে নদী। সাম্প্রতিককালের অনেক জনপ্রিয় গানের একটি আবু জাফরের 'এই পদ্মা এই মেঘনা, এই যমুনা-সুরমা নদী তটে/ আমার রাখাল মন গান গেয়ে যায় এই আমার দেশ, এই আমার প্রেম আনন্দ বেদনায়, মিলন-বিরহ সংকটে...।'

পাখির নামে, ফুলের নামে, মানুষের নামে, নিজের প্রিয় গ্রামের নামে, পৌরাণিক দেব-দেবীর নামে। নদীর নাম রূপসা (খুলনা), নদীর নাম আগুনমুখা (পটুয়াখালী), নদীতে যখন প্রবল ঢেউ উঠে তখন দূর থেকে নদীর মোহনার দিকে তাকালে আগুনের লেলিহান শিখার মতো মনে হয়–এই থেকেই নদীর নাম আগুনমুখা। পাখির নামে নদীর নাম রংপুরের পায়রা, ডাহুক পাখির নামে ডাহুক নদী জলপাইগুড়ি এলাকা থেকে এসে পঞ্চগড়ের তেতুলিয়া উপজেলার রওশনপুর গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশে।

মানুষের নামেও নদী আছে, মুসা খান নামের নদী রাজশাহী-নাটোর সড়কের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। আড়িয়াল খাঁ নামের নদীটি নরসিংদী জেলার মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হয়েছে। ফুলের সাথে সাদৃশ্য নদীও আছে-রাজবাড়ি জেলার চন্দনা, কুড়িগ্রামের ফুলকুমার নদী। ঈশ্বরযুক্ত নদীও আছে-ভুবনেশ্বর (ফরিদপুর), কাকেশ্বর (পাবনা), ঈশ্বরী যুক্ত ধলেশ্বরী (সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলার

সীমানা নির্দেশক), গঙ্গাযুক্ত নদীও আছে-কালিগঙ্গা (পিরোজপুর), বুড়িগঙ্গা (ঢাকা)। মাছ ধরতে ধরতে নদীর নামও দিয়েছে মাছের নামে-ইলাশা (ভোলা), চিতলখালী (শেরপুরের ঝিনাইগাতি, পুটিমারি (বাগেরহাট)। পশুর নামে নদীর নাম ঘোড়াখালী (নড়াইল), ঘোড়ামারা (পঞ্চগড়)। আবার বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে একই নামে অনেকগুলো নদী যেমন ইছামতি নামেই ৯টি নদী পাওয়া যায়, এগুলো হচ্ছে– কুষ্টিয়া, গাইবান্ধা-বগুড়া, দিনাজপুর, পাবনা, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, রাঙামাটি, সিরাজগঞ্জ, সাতক্ষীরা। সোনাই নামে সাতক্ষীরা, হবিগঞ্জ-ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, হবিগঞ্জে চারটি, করতোয়া নামে নীলফামারী, পঞ্চগড়ে, কাটাখালী নামে গোপালগঞ্জ, খুলনা-সাতক্ষীরা, গাইবান্ধা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, নড়াইল, ঘোড়াখালী নামে কয়েকটি নদী রয়েছে।

আবার নদীর ভাঙনে তলিয়ে গেছে বাপ-দাদার ভিটে। তলিয়ে গেছে মসজিদ-মন্দির, ধানের জমি, খেলার মাঠ, পাঠশালা। তখন বিক্ষুব্ধ হয় মানুষ। মানুষ তখন নদীর নাম রাখে কীর্তিনাশা। কেনো রাখবে না, এই কীর্তিনাশা ১৭৮৭ সালে প্রবল বন্যায় যখন পদ্মা তার গতিপথ পরিবর্তন করে তখন বিক্রমপুরের জমিদার চাঁদ রায়, কেদার রায়, রাজা রাজবল্লভের কীর্তিসহ প্রায় ৫০টি গ্রামের কীর্তিনাশ করেছিল যে নদী, তাকে তো কীর্তিনাশা ডাকবেই তো। কীর্তিনাশার বুকে হারিয়ে গেছে কত ফসলের জমি। বাংলাদেশে আরো দুটো নদীর নাম আছে খেপা (দিনাজপুর) ও পাগলা (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)।

আবার এক সময়ের খরস্রোতা নদী তার ছিল প্রবল প্রতাপ, দুই কূল ভেঙে নিয়ে গেছে, প্রমত্ত নদী বর্ষায় পাড়ি দিতে পাকা মাঝিরাও পেয়েছে ভয়। সেই ভয়াল নদী শুকিয়ে গেছে, মানুষ সেই নদীর নামের সাথে জুড়ে দিয়েছে 'বুড়াবুড়ি', জুড়ে দিয়েছে 'মরা' শব্দটি। এজন্যেই নদীর নাম বুড়িগঙ্গা ((ঢাকা), বুড়িতিস্তা (নীলফামারী), মরা আত্রাই (নাটোর), মরা কুমার (ফরিদপুর), মরা তিস্তা (রংপুর)।

আমাদের সংগ্রাম আন্দোলনেও নদী আছে। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে এদেশের দামাল ছেলেদের জন্যে নদী ছিল সহযোগী আর পাক আর্মিদের জন্যে ছিল মরণ ফাঁদ। নদীর উপরের ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে পাক আর্মির গতি করেছে রোধ। রাতের অন্ধকারে মুক্তিসেনারা নদী দিয়ে দ্রুত চলে গেছে অপারেশনে। মাঝি সেজে তথ্য সংগ্রহ করেছে, পৌঁছে দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে নদীভাঙন, খরা উল্লেখযোগ্য। নদীভাঙন সাধারণ বর্ষাকালেই বেশি ঘটে। এছাড়াও অন্যান্য ঋতুতেও কমবেশি ঘটে। পদ্মা-মেঘনা-যমুনার মতো প্রধান নদী ছাড়াও কুশিয়ারা, ধরলা, পায়রা, ডাকাতিয়া, করতোয়া, বড়াল, আড়িয়াল খাঁ, কর্ণফুলি, শঙ্খ প্রভৃতি নদীতে সারা বছরই ছোটো-বড়ো ভাঙন হয়। বাংলাদেশের সব নদীই সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে অথবা যমুনার মতো চরোৎপাদী ধরনের। নদীর এই সর্পিল ও চরোৎপাদী বৈশিষ্ট্য ভাঙনের জন্যে বিশেষ অনুকূল। এই বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের ছোটো-বড়ো, সাধারণ বা সহসা প্রবাহী সব নদীতে দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এক জরিপে লক্ষ্য করেছে যে, বাংলাদেশের ১৬টি নদীর ২৫৪ স্থানে উল্লেখযোগ্য নদীভাঙন লেগে আছে। এর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীতে ভাঙনের স্থান সবচেয়ে বেশি। ভাঙনে ঘরবাড়ি, ফসলি জমি, মসজিদ-মন্দির, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট চলে যায় নদীর গর্ভে। নদীর ভাঙন লাখো লাখো মানুষকে নিঃস্ব করে দেয়, মানুষ হয় 'সকালবেলা আমির রে ভাই/ফকির সন্ধ্যাবেলা/এই তো নদীর খেলা।' নদী ভাঙনের ফলে মানুষের ব্যাপক স্থানচ্যুতি ঘটে।

তারপরও নদী এনে দেয় পলি, জমিকে করে উর্বর, গড়ে উঠে সুজলা-সুফলা বাংলাদেশ। ধান বোঝাই নৌকার লগি ঠেলতে ঠেলতে কৃষক নিজের মতো গায়–ও আমার বাংলাদেশ, প্রিয় জন্মভূমি। কারণ নদী আমাদের সৌন্দর্য, নদী আমাদের ঐশ্বর্য, নদী আমাদের প্রাচুর্য, নদ-নদীই বাংলাদেশের মানুষের আনন্দ বেদনার কাব্য।

সেলিম আউয়াল: লেখক, সংগঠক ও ব্যুরো প্রধান, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস), সিলেট অফিস

জাপানে বাংলাদেশ দূতাবাসে এনআইডি সেবা চালু

জাপানের টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সেবার কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। ২২শে আগস্ট দূতাবাসের হলরুমে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেন, জাপানে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের অনেকের জাতীয় পরিচয়পত্র নেই। ফলে তাদের দেশে অনেক ধরনের সেবা প্রাপ্তিতে সমস্যায় পড়তে হয়। এনআইডি কার্যক্রম উদ্বোধনের মাধ্যমে এখন জাপান প্রবাসী বাংলাদেশিরা দূতাবাস থেকেই এনআইডি সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। তিনি আগামী নির্বাচনে প্রবাসীরা যাতে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারে সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানান। জাপানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. দাউদ আলী বলেন, জাপানে এনআইডি সেবা চালুর মাধ্যমে এখানকার প্রবাসী বাংলাদেশিদের দীর্ঘদিনের একটি দাবি পূরণ হলো। অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা, জাপানে বসবাসরত বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্য ও দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্য অনলাইনে (https://services.nidw.gov.bd) আবেদন করে দূতাবাসে বায়োমেট্রিক তথ্য ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

ডেঙ্গু রোধে চাই সচেতনতা

কমল চৌধুরী

ডেঙ্গু হলো 'ফ্লু' এর মতো একটি রোগ, যেটা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত বেশির ভাগ মানুষের আলাদা কোনো উপসর্গ থাকে না। তবে এটি জ্বরজনিত অসুস্থতা সৃষ্টি করতে পারে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজনও হতে পারে। এমনকি ডেঙ্গুতে মৃত্যুও ঘটতে পারে।

এডিস এজিপ্টি এবং এডিস অ্যালবোপিকটাস মশা ডেঙ্গু ভাইরাস বহন করে। এই মশাগুলো আফ্রিকা মহাদেশের আদিবাসী। তারা আফ্রিকার উষ্ণ জলবায়ুতে বাস করে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে তারা এশিয়া, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৮ শতকের শেষের দিকে, আমেরিকায় এডিস এজিপ্টি মশার আবির্ভাব ঘটে এবং এশিয়ায় প্রথম এডিস অ্যালবোপিকটাস মশার আবির্ভাব ঘটে। তবে, বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত ডেঙ্গু ভাইরাস শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। ১৯৪৪ সালে ড. অ্যালবার্টার সাবিন প্রথম ডেঙ্গু ভাইরাস শনাক্ত করেন এবং একে ডেঙ্গু-১ এবং ডেঙ্গু-২ হিসেবে আলাদা করেন। ১৯৫৬ সালে হ্যামন এবং তার সহকর্মীরা দুটি নতুন ডেঙ্গু ভাইরাস শনাক্ত করেন এবং তাদের নাম দেন ডেঙ্গু-৩ এবং ডেঙ্গু-৪। এই চার ধরনের ভাইরাসের কারণে ডেঙ্গুজ্বর হতে পারে। তবে এর মধ্যে ডেঙ্গু-২ এবং ডেঙ্গু-৩ ভাইরাস বেশি মারাত্মক। প্রায় তিন বছর ধরে ডেঙ্গুর চারটি ধরনের মধ্যে ধরন (ভেরিয়েন্ট)-২-এ বেশি মানুষ আক্রান্ত হতো। চলতি বছর এর সঙ্গে ধরন-৩-এ আক্রান্ত বেড়ে যাচ্ছে। এই ধরনে বেশি আক্রান্তের ঘটনা ঘটছে রাজধানীতে। সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত বিশ্বের ১৭৫টি দেশের ডেঙ্গু সংক্রমণের তথ্য প্রকাশ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। সেখানে বাংলাদেশে ডেঙ্গুতে মৃত্যুহার দেখানো হয়েছে ০.৫২ শতাংশ। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে ৪৪ হাজার ৬৯২ জন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশে কেবল হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের তথ্যই সংরক্ষিত হয়। বিপুলসংখ্যক রোগী ঘরে থেকেই চিকিৎসা নেয়, যাদের হিসাব ডেটায় আসে না।

এডিস মশা শুষ্ক জায়গায় ডিম পাড়ে এবং পানি ছাড়া তাদের ডিম ফুটে না। তাদের ডিম ১ থেকে ৪ বছর পর্যন্ত ভালো থাকে। ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি তাপমাত্রায়, ৩৫ ঘণ্টা এবং সর্বোচ্চ ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ডিম ফুটে বের হয়। একবার মশা ভাইরাস বহন করলে, এটি সারাজীবন তার শরীরে থাকে। যদি মশা ডেঙ্গু রোগীকে কামড়ায়, তাহলে এটিও ভাইরাস বহন করবে। যারা দ্বিতীয়বার ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হন তাদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি থাকে। তবে, ডেঙ্গু কোনও ছোঁয়াচে রোগ নয়। সমস্ত ডেঙ্গু ভাইরাস মানুষের ক্ষতি করে না। ডেঙ্গুর প্রথম লক্ষণ হলো জ্বর। মশার কামড়ের ৭-৮ দিন পরে জ্বরের লক্ষণ দেখা দেয়। রোগীর উচ্চ মাত্রা ১০৪-১০৫ ডিগ্রি পর্যন্ত বেড়ে যায়। পুরো শরীরে এমনকি হাড়ে ব্যথার পাশাপাশি। বমি বমি ভাব, ত্বকের নীচে রক্তপাত, মাড়ি, নাক থেকে রক্তপাত। লাল বা কালো রঙের মল। আক্রান্ত ব্যক্তির বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ অঙ্গ থেকে রক্তপাত হতে পারে। ফলস্বরূপ, রক্তের সংখ্যা হ্রাস পায়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, রক্তের সংখ্যা এক লক্ষের নীচে নেমে গেলে রোগীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তির প্রথম দিনই মারা যায়। বেশির ভাগ মৃত্যুর কারণ হলো ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং হাসপাতালে পৌঁছাতে দেরি হওয়া।

এডিস মশা যেখানে ডিম পাড়ে, অর্থাৎ তার প্রজননস্থল, সেই সমস্ত স্থান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা প্রয়োজন। ঘরের চারপাশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি, মাটির পাত্র, টায়ারযুক্ত প্লাস্টিকের পাত্র এবং সিমেন্টের তৈরি চৌবাচ্চা পরিষ্কার রাখতে হবে। ৫ দিনের বেশি কোথাও যাতে পানি জমে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি, নিয়মিত ফগিং করতে হবে। ফগিংয়ের সময়, ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ রেখে কমপক্ষে ২০ মিনিট পর খোলা রাখলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। যেহেতু এডিস মশা সন্ধ্যায় এবং

ভোরে বেশি কামড়ায়, তাই ভোর থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যার আগে এবং পরে মশার কয়েল বা স্প্রে ঘরের ভেতরে ব্যবহার করা উচিত। এছাড়াও, ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করতে হবে। এডিস মশা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য স্কুলে পাঠানোর সময় শিশুদের জুতা, মোজা এবং হালকা রঙের ফুলহাতা শার্ট এবং প্যান্ট পরা উচিত। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ক্লিনিক, টার্মিনাল এবং নির্মাণাধীন বাড়িতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা উচিত। বাড়ি ফিরতে হবে।

পুরো দেশে বা সিটি কর্পোরেশনগুলোতে প্রতিটি ওয়ার্ডের অলিগলিতে সংক্রমণের ডেটাভিত্তিক সিদ্ধান্তই হতে পারে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের মূল অস্ত্র। কোন এলাকায় কত সংক্রমণ, কোন ঋতুতে কোন প্রজাতির মশা বাড়ছে, কোন ওষুধ বেশি কার্যকর–এসব তথ্য নিয়মিত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ জরুরি।

ডেঙ্গুর পরিবর্তনশীল চরিত্রের ওপর নজর রেখে মাঠ পর্যায়ে এর গবেষণা বাড়াতে হবে। ডেঙ্গু ভাইরাসের ধরন প্রতিবছর বদলায়, সংক্রমণের গতি বদলায়, রোগীর প্রতিক্রিয়াও পরিবর্তিত হয়। অথচ দেশে গবেষণা সীমিত, নীতি প্রণয়নে গবেষণাভিত্তিক সিদ্ধান্তের অভাব আরো সীমিত। প্রতিবছর একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু রোগের আচরণ সে অনুযায়ী ধরা পড়ছে না।

বাংলাদেশ সরকার এডিস মশার বিস্তার রোধে একটি ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনসহ দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন পৌরসভায় নিয়মিত মশা নিধনকারী স্প্রে করার পাশাপাশি জনগণকে সচেতন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন এবং দেশের সকল সিটি কর্পোরেশনের এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পরিচালনা করা হয়েছে।

এই পৃথিবী আমাদের। সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আমাদের। আমরা পৃথিবীকে শিশুদের জন্য বাসযোগ্য করে তুলব- এই হোক নবজাতকের প্রতি আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার। ডেঙ্গুর মতো কোনও রোগ যাতে পৃথিবীকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলতে না পারে সেদিকে আমাদের সকলকে নজর রাখতে হবে।

কমল চৌধুরী: সিনিয়র সাংবাদিক, কলামিস্ট এবং কবি

জুলাই কন্যা অ্যাওয়ার্ড ২০২৫

আগামীর বাংলাদেশ গঠনে নারীদের প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, নারীরা যোগ্যতা, কমিটমেন্ট ও আন্তরিকতার দিক থেকে এগিয়ে; তাই আগামীর বাংলাদেশে নারীরাই হবে মূল শক্তি। ৮ই আগস্ট ঢাকায় কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে জুলাই কন্যা ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'জুলাই কন্যা অ্যাওয়ার্ড ২০২৫' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় উপদেষ্টা এ আহ্বান জানান।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, নীতি নির্ধারণী পর্যায় থেকে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি কীভাবে জুলাই কন্যাদের সামনে নিয়ে আসা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জাতীয় পর্যায়ের বড়ো বড়ো অনুষ্ঠানে তাদের যথাযথ জায়গা দেওয়া হয় না। তিনি বলেন, আমরা এখনো দেখি শহিদদের মা জাতীয় সংগীত শুনতে শুনতে অশ্রুসিক্ত হন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নারী যোদ্ধাদের সংখ্যা কম হলেও তাদের অবদান অবিস্মরণীয়। প্রতিটি আন্দোলনের পেছনে মায়েদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

উপদেষ্টা আরও বলেন, '৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং '২৪- এর গণ-অভ্যুত্থান পর্যন্ত নারীরা সামনের সারিতে ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর বা আন্দোলন শেষে নারীদের স্থান প্রান্তিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ করে দেওয়ার প্রবণতা ছিল, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ফরিদা আখতার বলেন, দেশের ৫১ শতাংশ নারীকে আর পেছনে রাখা যাবে না। অধিকার কেউ দিয়ে যায় না, তা আদায় করে নিতে হয়। জুলাই কন্যা ফাউন্ডেশনের মূল কাজ হওয়া উচিত নারীদের অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করা।

অনুষ্ঠানে ১০০ নির্বাচিত নারীদের হাতে 'জুলাই কন্যা অ্যাওয়ার্ড ২০২৫' সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। পাশাপাশি তাদের জীবন ও কর্মভিত্তিক সাফল্যের গল্প তুলে ধরা হয়, যাতে অন্য নারীরা অনুপ্রাণিত হতে পারেন।

প্রতিবেদন: সুলতানা শিমুল

মশক নিধনে সরকারের কার্যক্রম

মো. হাসনাত আলী

বিশ্ব মশক দিবস প্রতিবছর ২০শে আগস্ট পালন করা হয়। মানব স্বাস্থ্যের ওপর মশার প্রভাব সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বাড়ানোই এ দিনের মূল উদ্দেশ্য। বিশেষ করে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, জিকা ভাইরাসসহ নানা সংক্রামক রোগ ছড়ানোর ক্ষেত্রে মশার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্বেগজনক। তাই এই দিনটি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়–একটি ক্ষুদ্র প্রাণীও কীভাবে মানবজীবনকে বিপন্ন করতে পারে।

বিশ্ব মশক দিবসের সূচনা ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার রোনাল্ড রসের অবদানকে স্মরণ করে। ১৮৯৭ সালের ২০শে আগস্ট তিনি আবিষ্কার করেন যে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু প্লাজমোডিয়াম মশার মাধ্যমেই মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। তাঁর এই আবিষ্কার চিকিৎসাবিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে এবং ম্যালেরিয়ার প্রতিরোধে মানব সভ্যতাকে একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে।

মশকবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টা ব্যাপক ও ধারাবাহিক। কিন্তু সফলতার জন্য জনগণের যৌথ অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। প্রতিটি পরিবারের উচিত নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, পানি জমে না থাকতে দেওয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সরকার ও জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই মশাবাহিত রোগের ঝুঁকি কমাতে সর্বোত্তম উপায়।

মশক নিধনে বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম

বাংলাদেশে ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও ম্যালেরিয়ার মতো মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে সরকার প্রতিবছর বিভিন্ন পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিশেষ করে বর্ষাকাল ও তার ঠিক পরে মশার প্রজনন বেড়ে যাওয়ায় সারাদেশেই সমন্বিত মশক নিধন অভিযান পরিচালিত হয়। নীচে বাংলাদেশের সরকারের নেওয়া প্রধান কার্যক্রমগুলো তুলে ধরা হলো–

১. সমন্বিত মশক ব্যবস্থাপনা (Integrated Vector Management - IVM)

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও পরিবেশ অধিদপ্তর যৌথভাবে মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি চালায়। এতে লার্ভা ধ্বংস, উৎসস্থল নিবারণ এবং রোগ নজরদারি একসঙ্গে করা হয়।

২. লার্ভা নিধন ও উৎসস্থল ধ্বংস

নর্দমা, পুকুর, খাল, জলাধার ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় লার্ভিসাইড ছড়ানো, জমে থাকা পানি পরিষ্কার করা, নির্মাণাধীন ভবনে নিয়মিত পরিদর্শন, পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ পালন করে বাড়ি ও আশপাশে পানি জমা না রাখতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা প্রভৃতি।

৩. ফগিং ও স্প্রে কার্যক্রম

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য সিটি ও পৌরসভা ফগিং (ধোঁয়া স্প্রে) এবং 'উল্ট্রালো ভলিউম' (ULV) স্প্রে করে প্রাপ্তবয়স্ক মশা নিধন করে। রোগপ্রবণ এলাকায় বিশেষ ফগিং দল মোতায়েন করা হয়।

৪. বাড়ি-বাড়ি পরিদর্শন ও জরিমানা

সিটি কর্পোরেশনের পরিদর্শকরা ট্যাংক, ড্রাম, টব বা ফুলের টবে পানি জমে আছে কি না, নির্মাণস্থলে পানি রাখার বালতি বা পাত্র সবকিছু পরীক্ষা করে। যেখানে লার্ভা পাওয়া যায় সেসব স্থানে জরিমানা বা নোটিশ দেওয়া হয়।

৫. হাসপাতালভিত্তিক নজরদারি ও দ্রুত সাড়া দল (Rapid Response Team)

ডেঙ্গু মৌসুমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর রোগীর রিপোর্ট সংগ্রহ, সংক্রমণের হটস্পট চিহ্নিত, আক্রান্ত এলাকার পাশে বিশেষ ফগিং ও লার্ভা নিধন চালায়, র‍্যাপিড রেসপন্স টিম আক্রান্ত অঞ্চল পরিদর্শন করে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়।

৬. গণসচেতনতা বৃদ্ধি

টিভি-রেডিও বিজ্ঞাপন, লিফলেট, মোবাইল এসএমএস, বিদ্যালয়ভিত্তিক কর্মসূচি এবং সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে জনগণকে, মশারি ব্যবহার, পরিচ্ছন্নতা রক্ষা এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত করা হয়।

৭. গবেষণা ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার

ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় GIS ম্যাপিং, লার্ভা ও মশার ঘনত্ব পরিমাপ, নতুন কীটনাশক ও বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল নিয়ে গবেষণা– এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

মশা নিধনে সরকারের প্রচেষ্টা সফল করতে জনসাধারণের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঘর-বাড়ি ও আশপাশ পরিষ্কার রাখা, জমে থাকা পানি সরানো এবং প্রয়োজন মতো মশারি বা রিপেলেন্ট ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা সরকারকে সহায়তা করতে পারি এবং নিজেদের স্বাস্থ্যকেও সুরক্ষিত রাখতে পারি। নর্দমা, জলাবদ্ধতা, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ সবকিছুই মশার বিস্তারের জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে। তাই এই দিনে সচেতনতা বৃদ্ধি ছাড়াও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মশারি ব্যবহার, ঘরে স্প্রে বা কয়েল প্রয়োগ, জমে থাকা পানি অপসারণের মতো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও স্বাস্থ্য বিভাগ এ দিনকে ঘিরে বিভিন্ন প্রচারণা, আলোচনাসভা, স্বাস্থ্যবিষয়ক ক্যাম্প ও মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। জনগণের অংশগ্রহণই সফল মশা নিয়ন্ত্রণের প্রধান শর্ত, কারণ মশার উৎপত্তিস্থল বেশির ভাগই মানুষের বসত এলাকাতেই পাওয়া যায়।

ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে ব্যক্তি পর্যায়ে করণীয় বিষয়ে নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সরকার। মশক নিধনে ব্যক্তি পর্যায়ে প্রত্যেক সচেতন নাগরিকের করণীয় কাজগুলো হলো–

১. বাড়ির ভেতর ও আঙ্গিনায় পানি জমে থাকার স্থান হতে পানি অপসারণ এবং নিয়মিত পরিষ্কার করা;

২. গোসলখানায় বালতি, ড্রাম প্লাস্টিক ও সিমেন্টের ট্যাংক কিংবা মাটির গর্তে কোনো অবস্থাতেই তিন দিনের বেশি পানি জমিয়ে রাখা যাবে না, কারণ স্থির পরিষ্কার পানিতে ডেঙ্গুর জীবাণু জন্মায়;

৩. বিভিন্ন রকম মশা নিরোধক কীটনাশক বা বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল এজেন্ট স্প্রে করা যেতে পারে, তবে পরিবেশের উপর কীটনাশকের কুপ্রভাবের কথা মাথায় রেখে পানি জমতে না দেওয়াটাই শ্রেয়;

৪. বাড়ি/ভবনের আশপাশে কোনো জায়গায় পানি জমা থাকলে লার্ভিসাইড স্প্রে করতে হবে বা পানি নিষ্কাশন করতে হবে;

৫. মশারির ভেতর ঘুমোনোর অভ্যাস করা;

৬. মশার বংশবিস্তার কমাতে পানির পাত্র ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখা;

৭. তিনদিন বা তার বেশি সময়ের জন্য কর্মস্থল বা বাসা-বাড়ি ত্যাগের পূর্বে হাই কমোডে কীটনাশক বা সাবান পানি ঢেলে ঢাকনা বন্ধ রাখতে হবে এবং লো কমোডের প্যানে কীটনাশক বা সাবান পানি দিয়ে প্যানের মুখ বন্ধ করে রাখতে হবে। এছাড়া বদনা, বালতি ইত্যাদি পানিশূন্য করে উল্টিয়ে রাখতে হবে।

সব মিলিয়ে, বিশ্ব মশক দিবস শুধু একটি আনুষ্ঠানিক দিন নয়; এটি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে সামান্য সচেতনতা ও নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে আমরা মশাবাহিত রোগ থেকে নিজেদের, আমাদের পরিবার ও সমাজকে সুরক্ষা দিতে পারি। চলুন সবাই মিলে অঙ্গীকার করি– নিজ আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখি, সবাই মিলে সুস্থ থাকি।

মো. হাসনাত আলী: প্রাবন্ধিক

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) কার্যক্রম

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) সেপ্টেম্বর মাসে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহ:

৬০জন ঘণ্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত প্রশিক্ষণ মডিউলে সরকারি কাজে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সকল পর্যায়ের কর্মচারীকে ৬০ জনঘণ্টা প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৮ই সেপ্টেম্বর-২০২৫ তথ্য ভবনের সম্মেলন কক্ষ (২য় তলা) ১ (এক) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে মহাপরিচালক খালেদা বেগম সেবা সহজীকরণ বিষয় অর্থবছর অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা করেন। তিনি সবাইকে যার যার শাখা অনুযায়ী ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে সেবা সহজীকরণ বিষয়ে বিভিন্ন দিক তুলে ধরতে বলেন। এতে সকলে শাখা অনুযায়ী ছোটোছোটো দলে বিভক্ত হয়ে সেবা সহজীকরণের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। ডিএফপি কীভাবে সেবা সহজীকরণ করে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানো যায়, সহজে মানুষের উপকার করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রত্যেকে নিজ নিজ গ্রুপে সহজীকরণের বিভিন্ন দিক লিপিবদ্ধ করেন এবং মহাপরিচালক মহোদয়সহ সবার সম্মুখে প্রত্যেক গ্রুপ থেকে সেবা সহজীকরণের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেন।

মো. জাহিদুল ইসলাম- পরিচালক। তিনি সিটিজেন চার্টার নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯৯১ সালে যুক্তরাজ্যে বিশ্ব সিটিজেন চার্টার চালু হয়। বাংলাদেশ ২০০৭ সাল থেকে সিটিজেন চার্টার চালু হয়।

মুহা. শিপলু জামান- পরিচালক। তিনি সুশাসন ও সুফল নিয়ে আলোচনা করেন। সুশাসনের বিভিন্ন দিকসমূহ-

১। আইন ও নীতি মেনে চলা, ২। স্বচ্ছতা, ৩। জবাবদিহি, ৪। জনগণের অংশগ্রহণ, ৫। দক্ষ ও কার্যকর প্রশাসন ৬। ন্যায়বিচার ও সমতা বজায় থাকে।

সুশাসনের মৌলিক নীতিসমূহ হলো:

১। আইনের শাসন, ২। স্বচ্ছতা, ৩। জবাবদিহি, ৪। দক্ষতা কার্যকারিতা, ৫। ন্যায্যতা ও অন্তর্ভুক্তি এবং ৬। সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গি।

সুশাসনের সুফল

১. টেকসই উন্নয়ন
২. দুর্নীতি নিয়ন্ত্রিত
৩. প্রশাসনিক স্বচ্ছতা
৪.গণতন্ত্রীকে শক্তিশালীকরণ
৫. সামাজিক, রাজনৈতিক স্থিতিশীল
৬. জনগণের মৌলিক অধিকার
৭. জনগণের আস্থা ও অংশগ্রহণ

সামাজিক সুরক্ষা

বিধবাভাতা, বয়স্কভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি।

তথ্য উপদেষ্টার সঙ্গে নবারুণ-এর লেখকদের মতবিনিময়

১৭ই সেপ্টেম্বর তথ্য ভবনে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর প্রকাশিত কিশোর মাসিক পত্রিকা 'নবারুণ'র লেখকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মোঃ মাহফুজ আলম বলেন, 'নবারুণ' পত্রিকা নিয়ে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। এই পত্রিকায় শিশু-কিশোরদের আঁকা ছবি ও লেখা গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করতে হবে। তিনি ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানসহ আর্থসামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখালিখি করার জন্য লেখকদের প্রতি অনুরোধ জানান।

'নবারুণ' পত্রিকা ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করে উপদেষ্টা বলেন, প্রকাশনার শুরু থেকে (১৯৭০ সাল) এ পর্যন্ত 'নবারুণ' পত্রিকার সব সংখ্যা ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হবে এবং তা জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। এতে পাঠক অনলাইনে পুরাতন সংখ্যা পড়ে সমৃদ্ধ হতে পারবেন।

মতবিনিময় সভায় আরও বক্তব্য রাখেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খালেদা বেগম। সভার শুরুতে 'নবারুণ' পত্রিকা বিষয়ে তথ্যচিত্র উপস্থাপনা করেন পত্রিকার সম্পাদক ইসরাত জাহান।

সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ-২০২৫

সরকারি দপ্তরসমূহ বছরে ১বার [বাংলাদেশ গেজেট ১৩.২ (ক)] ৬০ জনঘণ্টা প্রশিক্ষণের আওতায় সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের আয়োজন করে ডিএফপি। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঞ্জীবনী আয়োজন করা হয়।

খুলনা বিভাগের সুন্দরবনে ১৮/০৯/২০২৫ থেকে সেপ্টেম্বর (৪ দিনব্যাপী) ১ম গ্রুপ ৪২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। এই প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন ডিএফপির মহাপরিচালক খালেদা বেগম এবং তার সহযোগিতায় ছিলেন ডায়না ইসলাম সিমা-উপপরিচালক, মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামান-উপপরিচালক, মোকাম্মেল হোসেন- সহকারী

পরিচালক চলচ্চিত্র এবং মো. আমিনুল ইসলাম- অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

২য় গ্রুপ শুরু হয় ২৫/০৯/২০২৫ থেকে ২৮/০৯/২০২৫ (৪ দিনব্যাপী) সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এতে মোট ৪৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন মো. জাহিদুল ইসলাম- পরিচালক চলচ্চিত্র, শাহিদা সুলতানা-সিনিয়র সম্পাদক সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ, মরজিনা ইয়াসমিন-সহকারী পরিচালক, মো. ফরিদ হোসেন-উপপরিচালক (চ: দা:)। তারা বিভিন্ন স্পট ঘুরে দেখেন যার মধ্যে আন্দারমানিক, জামতলা টাওয়ার, কটকা অভয়ারণ কেন্দ্র, কচিখালী অভয়ারণ্য কেন্দ্র, টাইগার পয়েন্ট টাওয়ার, ডিমের চর, জামতলা সী-বিচ, ডলফিন টাওয়ার, করমজল ইত্যাদি। সন্ধ্যায় পরিবেশ দূষণ রোধে করণীয় এবং ভ্রমণ থেকে শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা ও প্রশিক্ষণ পর্ব ইত্যাদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

আব্বাকে মনে পড়ে আমার

শাওন আসগর

সকাল থেকে আব্বাকে মনে পড়ছে। ঘুম ভেঙে গেল। দেখি আব্বা ঘরে নেই। প্রতিদিন আব্বা আমাকে ডেকে বলেন– উঠে ফ্রেশ হয়ে নামাজ পড়ে টাইমলি অফিসে যাওয়ার প্রিপারেশন নাও। আজ কী হলো আব্বার?

আমি যে কত বড়ো, সংসার করছি, চাকরি করছি তবু আমাকে শাসনের কোনো পরিবর্তন হয়নি আব্বার। সকাল, বিকাল এবং রাতের রুটিন আমাকে চোখে চোখে রাখা আর শাসনের জালে বন্দি রাখা আব্বার প্রধান কর্তব্য। এটা যেন তার এবাদতের অংশ।

ছোটোবেলা থেকেই তার দৃষ্টি আমার ওপর ভিন্ন রকম ছিল। স্কুল থেকে বাসায় ফিরতে দেরি হলেই হইচই এবং অবশেষে আমাকে জড়িয়ে ধরে চোখের পানি ফেলত। বলত, আমার কেউ নেই, তোকে হারিয়ে ফেললে আমি বাঁচব না।

আমি বলতাম, আব্বা আমি ক্লাস টেনে পড়ি। বন্ধু আছে, ছুটির পর একটু গল্প করি। আপনি টেনশন করবেন না। আব্বা একথা মানতে রাজি নন। তিনি বলেন, বন্ধুদের নিয়ে বাসায় এসে গল্প করো।

আমি গণিতে খুব খারাপ করি। বার্ষিক পরীক্ষায় তেতাল্লিশ পেয়েছি বলে আলিজান স্যার আমাকে বেত দিয়ে খুব মারলেন। আব্বা মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেন, খুব রাগ করলেন। তিনি বললেন, হেডমাস্টারের কাছে যাবেন। এই হলো অবস্থা। আমি জানি অন্য কেউ আমাকে আঘাত করলে আব্বা সইতে পারেন না। আমার জ্বর এলে চারদিন আব্বাও অফিসে যাননি। এই চারদিনের সেবা আমি কখনো ভুলতে পারব না।

সেই আব্বা, আব্বা আমাকে না বলে কোথায় গেল?

একবার, সেই ছোটোবেলায় নূরু ভাইয়ের পাল্লায় পড়ে রিকশার পেছনে ঝুলে বাসায় ফিরছিলাম। আব্বা সব দেখলেন কিন্তু পথে কিছুই বললেন না। মাগরিবের পর আব্বা বাসায় এসে রাগ

ঝাড়লেন। তার লাল চোখ দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। তিনি আমাকে মারলেন, তার হাতে থাকা ছাতি দিয়ে পেটালেন। সেবারও আমি চারদিন ধরে জ্বরে পড়েছিলাম। সেবার জ্বরে এবং মারের ব্যথায় খুব কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু আব্বা তৃতীয় দিন কাছে এসে বললেন, তুমি খুব একটা ছোটো নও। তোমার এখন থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত তুমি কার সাথে চলবে, কার সাথে বসবে।

জ্বর ভালো হলে আমি বসেছিলাম, তবে কোনো বন্ধু ছিল না। আমি বসেছিলাম আমাদের বাসার পাশেই শীতলক্ষ্যা নদী, সেই নদীর পাড়ে বসে দেখছিলাম নদীর ঢেউ। পালতোলা নৌকা ছোটো ছোটো জাহাজ। তার ওপারে বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র। তার পাশেই ছিল নদীর পাড়ে বিশাল অংশজুড়ে বিস্তৃত কাশবন। শুধু যেন একটি সাদা রেখা আমার চোখে পড়ত তখন হয়ত শরৎকাল ছিল। তখনো শরৎকাল বুঝি না।

বার বার আব্বার কথা বলছি।

আপনি হয়ত ভাবছেন আমার মা কোথায়। আমার মা মনোয়ারা বেগম, আমার খালা আনোয়ারা বেগম। যখন দেশে যুদ্ধ হয়েছিল, তখন আমরা ছিলাম নানুর বাড়িতে। আমার মাকে পাকসেনারা ক্যাম্পে নিয়ে ধর্ষণ করেছিল, সেই লজ্জায় আমার মা আত্মহত্যা করেন।

আমি তখন খুবই ছোটো। সেসব স্মৃতির গভীরতায় আমি কখনোই ঢুকতে পারিনি। তবে আমার মগজের পেনড্রাইভে এগুলো স্মৃতি হয়ে লোড করা আছে। আবার স্মৃতির পেনড্রাইভে এখনো জীবন্ত আছে আমার ছোটো খালা আনোয়ারা বেগম। খালা আমাকে খুবই স্নেহ করতেন, বিশেষ করে আমার মা আত্মহত্যা করার পরবর্তী দুই বছর আমি খালার স্নেহে বড়ো হয়েছি। সে কেমন আছে আমি এখন জানি না, তবে যখন আমাদের স্বাধীনতা দিবস আসে, যখন স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করি আমার অফিসে তখন মায়ের কথা খুব মনে হয়। আমি কাঁদি, নীরবে কাঁদি আর ঐ সব ধর্ষকদের অভিশাপ দিতে থাকি। আমার মা যে ধর্ষিতা হয়ে আত্মহত্যা করেছেন, নিজের মা বলেই এ কথা কাউকে বলে বেড়াই না। তারপর থেকেই আমি একা।

আর আব্বা! আব্বা ঘরে নিয়ে আসেন সৎ মা। সৎ মাকে আমার কাছে আসতে দেননি আব্বা। আব্বা মনে করতেন– সৎ মা কখনোই ভালো হতে পারে না। শুধু সংসারের প্রয়োজনে কেবল সৎ মাকে বিয়ে করেছেন। কিন্তু আমার জন্য আব্বার আলাদা জগৎ, আলাদা জীবন, আলাদা স্নেহ, আলাদা শাসন, আলাদা আদর।

যখন শহরে এলাম, প্রাইমারি স্কুল ডিঙিয়ে হাই স্কুলে উঠলাম, যখন আলীজান স্যার আমি গণিতে নম্বর কম পেয়েছি বলে বেত দিয়ে মারলেন তখন আব্বার রাগ আমি অনুভব করেছি। কিন্তু তিনি তার স্নেহের সকল দরজা আমার জন্য খুলে দিলেন। আমাকে বলতেন মাগরিবের পূর্বেই যেন ঘরে ফিরে আসি। আবার এটিও বলতেন এশার নামাজ যেন আমি মসজিদে আদায় করে আসি।

আমরা দিনিয়াত বই পড়তাম। সেখানে আমাদের নবীর দাঁত শহিদ হয়েছে বলে যে অধ্যায় ছিল তা পড়ে পড়ে আমি বাচ্চাদের মতো কাঁদি। অনেকক্ষণ পর আমি শান্ত হলে আব্বা পাশে এসে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত বুলাতেন।

একদিন আমার রুমে এসে বললেন– আজ থেকে আকবরের দোকানে যেও। ওখানে তোমার জন্য দুধের সর রাখা হবে। এশার নামাজের পর প্রতি রাতে তুমি এক কাপ সর খেয়ে আসবে। আর মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে যেন গণিতের নম্বর কম না হয়।

সেই থেকে আব্বার স্নেহের বিষয়টি আমাকে খুব আপ্লুত করেছে। তারপর বাকি জীবন আমি আব্বাকে ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারিনি। আমার বই কিনা আমার পোশাক আমার তেল-সাবান আমার হাত খরচ সকল কিছু আব্বাই দেখভাল করতেন।

সেই আব্বাকে দেখেছিলাম যখন আমি প্রথম চাকরিতে জয়েন করি। যেদিন আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট কার্ড পিওন দিয়ে গেল আব্বার চোখে আনন্দে পানি চিকচিক করে উঠল। আব্বা সেদিন মাগরিবের নামাজের সময় আরো দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করলেন।

অবাক করা বিষয় প্রথম দিন থেকেই আমি যেন অফিসে সময় মতো যাই, দুপুরে যেন সময় মতো খাই, বিকালে যেন নির্ধারিত সময়ে ঘরে ফিরে আসি- এসব নিয়ে আব্বা এক প্রকার আমাকে অস্থির করে রাখলেন। আমি যে বড়ো হয়েছি, আমার যে একটি বাইরের জগৎ আছে, আমার যে কলিগ বন্ধুরা থাকে- এসব তিনি মনের ভেতরেই ঢুকালেন না।

এ অবস্থাতেও আব্বা আমাকে নিয়ে বাজারে ঢুকেন। আমার প্যান্ট কিনেন। শার্ট কিনেন, জুতা, কিনেন। কতটা হাস্যকর বিষয়, আমি আব্বার আদর অথবা শাসনের বাইরে যেতেই পারি না। মাঝে মাঝে এটাও ভাবি- থাক আব্বা আছেন বলেইতো আমি আব্বার স্নেহের ছায়ায় বেড়ে উঠছি, দম পাচ্ছি, আয়ু পাচ্ছি। একবার লুকিয়ে লুকিয়ে আমি একটি শার্ট কিনেছিলাম বলে কত বকাই না বকলেন। আমিও কম জেদ করিনি। তখন আমি জেদ করে সেই শার্টটি আগুনে পুড়িয়ে হলুদ খামে ছাই ভরে রেখেছিলাম। সেই হলুদ খামে তারিখ দিয়ে রেখেছিলাম। তারপর একদিন সাহস করে আব্বাকে দেখিয়ে বললাম– আব্বা আপনি যে আমাকে খুব বকেছিলেন মনে আছে? এটি হলো ঐ শার্টের স্মৃতি। আব্বাকে আরো খোলাসা করে বলার পর বললেন, ঠিক আছে আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এখন থেকে তুমিও কাপড়চোপড় কিনবে, আমিও তোমাকে পছন্দমতো কাপড় কিনে দেবো।

সেই আব্বা। আমার খবর নিচ্ছে না, আমাকে না বলে চলে গেলেন। অথচ মোবাইলটাও সাথে করে নিয়ে গেলেন না। কী পরে গেলেন, তাও আমি দেখলাম না। আব্বা কোথায় গেলেন ? আব্বা তো রিটায়ার্ড করেছেন আরও চার বছর পূর্বেই। এখন তো আর তার অফিস নেই, নিয়ম মেনে ঘরের বাইরে যাওয়ার কোনো বিষয় নেই।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাহিরে উঁকি দিলাম। বাইরে ঝিরঝির বৃষ্টি। আশ্বিন মাস, এখন শরৎকাল। এই শহরে ভারী বৃষ্টি হলে কয়েক স্থানে রাস্তা ডুবে যায় কিন্তু এখানে এই ২৫ বছরে কখনো পানি জমতে দেখিনি। ঘর থেকে নামলেই রিকশা পেতে কোনো সমস্যা হয় না।

পথের কাছেই বাসা। রিকশার টুংটাং শব্দ। লেগুনা যাচ্ছে, ব্যাটারিচালিত রিকশার কারণে অলিতে-গলিতে তীব্র যানজট লেগেই আছে। আব্বা কোথায় আর যেতে পারেন, এখনতো আগের মতো হাঁটতেও পারেন না। আব্বা কি কাউকে না জানিয়ে গ্রামের বাড়ি চলে গেলেন! এক মাস যাবৎ আব্বার শরীর ভালো যাচ্ছে না। গেল সপ্তাহে ল্যাবএইড হাসপাতালে নিয়ে গেলাম ডাক্তার দেখাতে। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন আর এক গাদা ওষুধ দেখে আব্বা খুব রেগে গেলেন। আমাকে বললেন, সময় হলে ডাক্তার আটকাতে পারবে না। টেনশন করো না। অত টাকাপয়সা খরচ করার দরকার নেই।

এক মাস যাবৎই আব্বার মনস্থির খুঁজে পাই না। এলোমেলো কথা বলেন, রাতে ঘুমাতে পারেন না ঠিকমতো। আর মাঝেমধ্যে মনোয়ারা মনোয়ারা বলে ডাকেন, আমার মাকে।

আমি অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হই আবার অজানা শঙ্কায় মনমরা হয়ে থাকি। উপরের দিকে তাকাই, আকাশের মালিককে কয়েকটি কথা বলি। বাতাসের মালিককে বলি, জমিনের মালিককে বলি আমার আব্বার কথা।

আমি অফিস থেকে বিকালে ফিরে আসি। আমার মগজ কাজ করছে না। আমার মগজের পেনড্রাইভে আব্বার জন্য যে ফোল্ডার করেছিলাম সেই ফোল্ডার ওপেন করে আব্বার নম্বরে ফোন করতে থাকি। বুকের পাঁজর খুলে চোখের পানি ফেলে আব্বাকে ডাকি। আমার অন্তর থেকে উৎসারিত কান্না আব্বা কেন বুঝতে পারেন না তা আমার মাথায় ঢুকে না।

আব্বা আমার কোনো কল রিসিভ করেন না। আমার কোনো ডাক তিনি শুনতে পান না। আমার আবেগ আমার কান্না তাকে স্পর্শ করে না। আমি যে তাকে আলী আসগর, আলী আসগর বলে অত ডাকি, অত ভাবি, তিনি কে তা দেখতে পান না, শুনতেও পান না?

মানুষ কবরে শুয়ে থাকলে সকল সংযোগ বন্ধ হয়ে যায়?

শরৎ মেঘের আশ্বিন গাথা

অর্ণব আশিক

আশ্বিনের বিমুগ্ধ আকাশের কার্নিশে জমে আছে শরতের মেঘ
বাঁধন ছিড়ে প্রগাঢ় মুগ্ধতা নিয়ে হঠাৎ ঝরে পড়ে বৃষ্টি ফোঁটা
ঝরঝর বৃষ্টি ফোঁটা উড়ে এসে রামধনুতে ছোঁয়ায় ঠোঁট
শুরু হয় অভিমানী শরতের শোক
তখন হয়ত তুমি কাশফুল বনে হাঁটো চুপিসারে
যদি কোনোদিন দেখা পাই মেঘেদের মতো
তোমার দু' ঠোঁটে দিবো বৃষ্টিময় চুম্বন।

হঠাৎ বৃষ্টির শেষে সলজ্জ কিশোরীর মতো হেসে উঠে আশ্বিনের রোদ
বুকের আশ্রয় থেকে বনজ গন্ধে ঝরে পড়ে অনুতাপ
গোধূলির মাধুকরী রং ছুঁয়ে কাঁদে কাশফুলের কথন
বৃষ্টি ভেজা রোদ যেন স্থলপদ্মের সৌরবিতান।

আশ্বিনের হঠাৎ নামা অঝোর ধারায় তুমি নেই
যদি চলতি পথে ঝরা পাতা আঁকড়ে ধরে পা
স্মৃতির ছায়াখানি বৃষ্টিকে সাক্ষী রেখে উড়ায় আঁচল
যদি জেগে উঠে আশ্বিনের বৃষ্টি ভেজা প্রেম
এ পৌরুষ তোমার কাছেই হবে সমর্পণ।

শরতের রঙে কী যে রঙিন

আতিক রহমান

কাঁচের স্বচ্ছ নীলাকাশ যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে
পেঁজা সে তুলোর সাদা মেঘমালা শিল্পিত ছবি আঁকে!
আষাঢ়-শ্রাবণ ছুটি নিয়ে গেল বর্ষার ছোঁয়া রেখে–
মাঠ-ঘাটগুলো বুক জাগাবেই ভাদ্র-আশ্বিন থেকে!
টিলা-পাড় ঘেঁষে বড়ো ভালোবেসে কাশফুলগুলো ফোটে,
শরতের রঙে রঙিন প্রকৃতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে!
গানের কলিতে প্রাণের দোলায় আত্মহারা এ মন
ধুমধাম করে তালের পিঠার ঘরে ঘরে আয়োজন!
গাছের শাখায় দেখা দেবে কুঁড়ি আমলকি-জলপাই
আরও কত ফুল শিউলি-বকুল ঘ্রাণ শোভা দেবে তাই।
রাত ডেকে আনে চাঁদের চমক, তারার ঝিলিক হাসি
জোনাক পোকার ছন্দিত আলো বুকে নিতে ভালোবাসি।
শিশিরে শিশিরে শীতল বাতাসে– স্বাগত জানায় ভোর
ঘুম থেকে উঠি মসজিদে ছুটি, কেটে যায় ঘুম-ঘোর।
স্বপ্ন আঁকছে আগামী সুদিন সোনালি ধানের শীষে-
বাংলার রূপ দেখে নিশ্চুপ হারিয়ে ফেলেছি দিশে!

শরতের রূপ

খোরশেদ আলম নয়ন

শিশির মাখা স্নিগ্ধ সকাল–পা জড়ালেই ঘাসে
মনের মাঝে নূপুর বাজে শরৎ বুঝি আসে।
ভোরের হাওয়ায় হিমেল পরশ–শিউলি ছড়ায় ঘ্রাণ
প্রজাপতি পাখনা মেলে–মন করে আনচান।

পাল তোলা নাও শ্যামলিমা গাঁও ঢেউ দোলা কাশফুল
রূপালি জলের ঝিলিক জাগানো মেঘনার দুই কূল,
এই কাশফুল এই নদীকূল–এখনো নিরন্তর
অন্তর জুড়ে বেঁধে দিয়ে যায়–শৈশব খেলাঘর।

বক-বালিহাঁস–পানকৌড়ি আর তিতিরের ঝাঁক
ভরদুপুরে যায় মাতিয়ে–মেঘনা নদীর বাঁক,
উতলা বাতাস–সুনীল আকাশ মেঘ পরিদের ডানা
মাথার উপর দেয় টাঙিয়ে রঙিন শামিয়ানা।

এই অপরূপ শরতের রূপ–দূর নীলিমার মায়া
এই নদী মাঠ–এই খেয়াঘাট শান্ত বটের ছায়া,
এ হৃদয় মাঝে সুর হয়ে বাজে কে যেন বাজায় বাঁশি
ভরা ভাদ্রের পূর্ণিমা যায়–জোছনার জলে ভাসি।

ভোর হলো ভেবে বনের পাখিরা–মাঝ রাতে জেগে ওঠে
মনের উঠোনে মায়াজাল বুনে–আবারও শিউলি ফোটে!

মায়াবী শরৎ

মনোয়ারা বেগম

শরৎ মানে কাশফুলের অবারিত স্বাধীনতা
শ্বেত বসনে সেজে ওঠে প্রকৃতি
তুলোর মতো ভেসে বেড়ায় মেঘমালা
রাতে ফোটা শিউলি ঝরে পড়ে ভোরবেলা।

শরৎ মানে হাওয়ায় দোলা কাশফুলের মাতামাতি
নদীর তীরে শুভ্রতার ঢেউ
ঠিক যেন ঝুঁকে পড়ে মাটির স্পর্শ চায়
পরক্ষণে মাথা তুলে আকাশের পানে ধায়।

ফুলে ফুলে প্রকৃতি সাজায় ফুলের ডালা
ধানক্ষেতে নুয়ে পড়া সোনা রঙা শিষ
মনমাতানো ঢঙে প্রজাপাতি-ফড়িংয়ের ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ খেলা
শরতের মায়াবী রঙে সবার মনে লাগে আনন্দের দোলা।

শরতের মেঘ প্রণয়

আসাদুজ্জামান খান মুকুল

শরৎ গগনে মেঘ করেছে খেলা,
গুরু গুরু হুংকারে সারাটা বেলা।
মেঘেরা বিনুনি খুলে পবনে উড়েছে দুলে,
সুরের লহরি তুলে ভাসিয়ে ভেলা,
বিমোহিত হয়ে দেখি আমি একেলা!

অবিরাম বরিষন ঝরে অঝোরে,
শেফালিকা ফুটে আছে থরে বিথরে,
কুসুমের কী যে ঘ্রাণ উতলা করেছে প্রাণ!
ফুঁসে উঠে প্রেমবান হৃদ গভীরে,
নিজেকে সামলে রাখি কেমন করে?

চকিত চমকে চাই জানালা ধারে,
দেখি কে যে আধো ভিজে এলো আহা রে!
কপালে অলক রাশি! মুখেতে মধুর হাসি!
সুধাইছে গৃহে আসি সে যে আমারে।
বারণ করিতে নারি আমি তাহারে!

হেরিয়া কুমারী প্রাণ হয় হরষা!
বোধে আসে কেটে গেছে ঘোর তমসা!
স্মিত হেসে বলি তারে এসো গো সজনী ধারে
তোমাতেই মন কাড়ে ওগো সরসা!
আমার জীবনে তুমি হলে ভরসা!

শুভ্র শরৎবেলা

শাকেরা বেগম শিমু

নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা,
কাশের বনে শুভ্র পরির মেলা,
শিউলি ঝরা স্নিগ্ধ সকালবেলা,
রোদ ও ছায়ার লুকোচুরির খেলা।

শুভ্র শরৎ তোমার কতই রূপমাধুরী,
সে রূপ দেখে সদাই তোমার প্রেমে পড়ি,
যায় সাদাবক সাদা মেঘের ডানায় উড়ি,
মাঠে থাকে নবীন সবুজ ধানের জুরি।

প্রতিবছর নতুন রূপে তুমি আসো,
প্রকৃতিকে নতুন করে ভালোবাসো,
চাঁদনিরাতে শুভ্র চাঁদের মতো হাসো,
দূর আকাশে মেঘের ভেলা হয়ে ভাসো।

শরৎ এসেছে

জাহাঙ্গীর চৌধুরী

তৃণের ঠোঁটের শিশির ফোঁটা
ঊষায় লাগলো পায়ে,
শরৎ বুঝি এসেছে আজ
বাংলাদেশের গাঁয়ে।

পাল তুলেছে মাঝিমাল্লা
ভুলি মনের জ্বালা,
পাড়ি দিবে আজ দূরপাল্লা
চলবে গানের পালা।

সাদা কাশের মাথা দোলে
নদীর কূলে-কূলে।
বায়ুর সাথে খেলছে ঝুলে
শরৎ কালের ফুলে।

বক চিল উড়ে আকাশ জুড়ে
সাথে মেঘের ভেলা,
পশ্চিম আকাশ সেজেগুজে
করছে ছবির খেলা।

রাতে ফোটে জুঁই চামেলি
পাপড়ি মেলে হাসে,
গন্ধ বিলায় নিশিগন্ধা
নিদ্রা আসে বাসে।

শরৎ মানে

গোপেশচন্দ্র সূত্রধর

শরৎ মানে–
নীল আকাশে
সাদা মেঘের ভেলা
শিউলি তলে শিশির ভেজা
রাঙা ফুলের মেলা।

শরৎ মানে–
গাছে গাছে
পাখির উড়া উড়ি
নীল আকাশ ঐ যে ওড়ে
দস্যি ছেলের ঘুড়ি।

শরৎ মানে–
সবুজ মাঠে
কচি ধানের মেলা
দূর আকাশে রবির হাসি
সকাল-সন্ধ্যা বেলা।

শরৎ মানে–
নদীর তীরে
সাদা কাশের ফুল
নদীর জলে পালের নৌকা
আকাশে বুল্ বুল্ ।

শরৎ মানে–
পুকুর জলে
রুপালি মাছের খেলা
ফুল বাগানে ফুলের মাঝে
প্রজাপতির মেলা।

শরৎ মানে–
প্রকৃতিতে
আনন্দ উৎসব
গাছে গাছে শ্যামা ঘুঘু
পাখির কলরব।

শরৎ মানে–
জ্যোৎস্না রাতে
চাঁদের স্নিগ্ধ হাসি
মাতৃভূমি সোনার বাংলা
তোমায় ভালোবাসি।

নদী

কাদের বাবু

দেখেছিলাম কল কল কল
ধরলা নদীর পানি,
এরপরেতে তিস্তা নদীর
নামটা আমি জানি।

ব্রহ্মপুত্র নদের নাম
এরপরে হয় জানা,
দুধকুমার নদের পাড়ে
নিয়েছিলেন নানা।

সুরমা নদীর নাম শুনেছি
পদ্মা দেখি নাই
যমুনার জল পার হয়েছি
মেঘনা যেতে চাই।

ঘাঘট নদীর জল ঘোলাটে
শীতলক্ষ্যাও খাস
বুড়িগঙ্গায় জীবন যে যায়
কষ্টে করি বাস।

তিতাস নদীর বাঁকে
ধানশালিকের দেশে
হরিণ নাকি থাকে?
বেড়াই হেসে হেসে।

নদীই আপন নদীই যাপন
নদীই আসল সুখ
বাংলাদেশের নদীর বুকে
লুকাই আমার মুখ।

গ্রাম চর বিলাশপুর ২১৩৭ সাল

কামাল হোসাইন

গ্রামের মানুষেরা একসময় জানত, চর বিলাশপুর তার মাটির বৈশিষ্ট্যে বিখ্যাত। তবে এখন আর তা নেই। মাটির প্রকৃতি বদলে গেছে। শস্যের ফলন প্রাকৃতিক নিয়মে হয়নি, বরং প্রযুক্তির সাহায্যে। এক সময়ের চিরায়ত গ্রাম এখন আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় পরিবর্তিত, কিন্তু মাটির গভীরে তার স্মৃতি থেকে যায়। গ্রামটি এখন আধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা পরিচালিত হলেও তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হারিয়ে যায়নি।

আরিয়ান গ্রামের এক নিরিবিলি বাড়িতে থাকে। বাড়ির চারপাশে অগোছালোভাবে লাগানো বিভিন্ন প্রযুক্তি যন্ত্র, সোলার প্যানেল, পানির ফিল্টারিং ডিভাইস এবং অটোমেটিক রোবট চাষযন্ত্র রয়েছে। অথচ আরিয়ানের মন সবসময় চুপচাপ, একাকী। গ্রামে প্রযুক্তি কতটা এগিয়ে গেছে, তার কিচ্ছু পরোয়া নেই। তার পছন্দ নয়, যেন দিনগুলো সময়ের প্রবাহে একাকার হয়ে থাকে।

বাবা-মায়ের বিজ্ঞানী জীবনে সে তেমন আগ্রহী নয়। তবে সেই ছোটোবেলা থেকেই সে শুনে এসেছে সময়ের কথা– এমন সময়, যখন স্মৃতিগুলো ছিল শুধু কল্পনা, আর সময়কে ছুঁতে পারে না কেউ।

আরিয়ানের মা-বাবা দুজনেই বিজ্ঞানী ছিলেন। তার মা কৃষিবিজ্ঞানে, আর বাবা পরিবেশবিজ্ঞানে ছিলেন বিশেষজ্ঞ। তবে তাদের বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম কখনোই আরিয়ানকে খুশি করতে পারেনি। বড়ো হওয়ার সাথে সাথে সে দেখতে পায়, তার বাবা-মায়ের মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক ছিল যা শুধু অভ্যন্তরীণ গবেষণায় সীমাবদ্ধ। কোনোদিন নিজেদের মধ্যে আড্ডা, সান্নিধ্য বা গল্পময় ছিল না। তাদের আলোচনার বিষয় ছিল শুধু উন্নত প্রযুক্তি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ধারণা নিয়ে। আরিয়ান মনে করত, তার বাবা-মা হয়ত তাকে কখনো বুঝতে পারে না। তাকে যেন তারা কেবল একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অংশ হিসেবে ভাবত।

তার বাবা ড. রূপক দত্ত, একজন প্রখ্যাত পরিবেশবিদ। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন নিয়ে। আর তার মা ড. মিতা দত্ত, কৃষির উন্নতি নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন এবং তিনি বিশ্বমানের প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করতেন। তাদের জীবন যেন এক নীরব ধারা, যেখানে কেবল 'উন্নতি' এবং 'গবেষণা' শব্দ দুটি ছিল প্রধান।

একদিন, ছোট্ট আরিয়ান তার মায়ের শোবার ঘরের তাক থেকে এক অদ্ভুত খাম বের করে। খামটি ছিল তার মায়ের পুরানো গবেষণা নথি– এটি ছিল 'Seed Project' নামের একটি গোপন প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত। তাতে তার মা লিখেছিলেন– 'যতই আধুনিক প্রযুক্তি আসুক, কিছু জিনিস বাকি থাকে যা কেবল মাটির গভীরে পাওয়া যায়– যা কেউ জানে না।'

এই কথাগুলো তার মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল, কিন্তু সে বুঝতে পারেনি মা কেন এমন কিছু বলেছেন। সেই দিন থেকেই তার মনের মধ্যে এক নতুন প্রশ্ন উঠেছিল– সময় এবং স্মৃতি সম্পর্কিত কিছু কী এতটাই গুরুত্বপূর্ণ?

এক ঝড়ের রাতে, যখন বাতাস আছড়ে পড়ছিল, আরিয়ান পুরানো লাইব্রেরিতে গিয়ে এক পুরানো শেলফের পেছনে একটি ধাতব বাক্স পায়। বাক্সটির উপরে ছিল লেখা– 'Seed Project – Top Secret'।

তার চোখ চকচক করে ওঠে। সে জানত, এটি তার বাবার বা মায়ের গবেষণার অংশ হতে পারে। বাক্সের ভেতরে ছিল একটি সিলভার বীজ, যেটি দেখতে ছিল প্রাকৃতিক আঙুরের মতো, কিন্তু তার আকৃতি ছিল অন্যরকম। তার সঙ্গে ছিল একটি ছোটো কাচের ডিসপ্লে, যেখানে লেখা ছিল– বীজ রোপণ করলে সময়ের ভেতর অতীত এবং ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়া যায়, তবে এটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

আরিয়ান প্রথমে এটাকে এক ধরনের ছলনা ভাবলেও, অদ্ভুতভাবে তার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে জানত, এটাই হতে পারে তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো রহস্য, তার বাবার বা মায়ের গভীর আবিষ্কার। সে নিশ্চিত ছিল, এটি কেবল একটি বৈজ্ঞানিক প্রকল্প নয়, বরং এর পেছনে ছিল কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য।

এক রাতের অন্ধকারে, আরিয়ান বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে পরিত্যক্ত জমিতে বীজটি রোপণ করে। তার সাথের ক্যামেরা ও সেন্সরগুলো পুরো পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল। প্রথম কয়েক দিন কিছুই ঘটে না। কিন্তু তৃতীয় রাতে, আশ্চর্যভাবে গাছটি গজায়। সেই গাছের পাতাগুলো ছিল স্বচ্ছ-ক্রিস্টাল, পানি ফোঁটার মতো ঝুলে থাকা এক ধরনের অস্বাভাবিক আলো ছিল তার গায়ে।

গাছটি তার কাছে যেন এক নতুন পৃথিবীর দরজা খুলে দেয়। আরিয়ান হালকা আলোর নীচে দাঁড়িয়ে, অবাক হয়ে দেখেছিল– গাছটি সঞ্চয় করছে একটি বিশেষ ধরনের শক্তি, যা সে একটু আগে কখনো অনুভব করেনি। এরপর তার মনে প্রশ্ন আসে– এই গাছের মধ্যে কীভাবে অতীতের স্মৃতি প্রবাহিত হয়?

একদিন রাতে গাছের চারপাশে গোলাকৃতির আলোটা ভেসে ওঠে। সেটা যেন এক ধরনের পর্দা তৈরি করে, যা তাকে অতীতে নিয়ে যায়। এই ঘটনা ঘটেছিল ২০৮০ সালে। আরিয়ান দেখতে পায়, তার প্রপিতামহ দাঁড়িয়ে মাটির নীচে বীজ বুনছেন এবং সেই মুহূর্তে তিনি বলে ওঠেন– এই জমিটা একদিন অনেক কিছু ধারণ করবে, কেউ একজন আসবে তা বুঝে নিতে।

এটি আরিয়ানের কাছে এক বিস্ময়কর মুহূর্ত ছিল। সে আরো কয়েক রাত ধরে স্মৃতি দেখতে থাকে– তবে সবই ছিল তার পূর্বপুরুষের জীবনের দৃশ্য, এবং তাদের নানা আবেগ, আঘাত, অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম।

একসময় আরিয়ান তার এই আবিষ্কার সম্পর্কে বন্ধুদের বলার জন্য ঘর থেকে বের হয় এবং বলে। কিন্তু তারপর কেবল বন্ধুরা নয়, আশপাশের লোকজনও জানতে পারে বিষয়টা। দ্রুতই চারপাশে হইচই শুরু হয়ে যায়। সবাই হুড়মুড় করে এসে অতীত দেখতে চায়– কিন্তু স্মৃতিগুলোর সাথে মিশে ছিল এক ধরনের ভারি অনুভূতি, যা তাদের মনকে ব্যথিত করে তোলে। সময়ের চাপে তারা স্থিতিশীল থাকতে পারে না।

এভাবে পুরানো স্মৃতির বোঝা সমাজে অস্থিরতা তৈরি করে। সময়ের স্মৃতি যে কতটা ভয়ংকর হতে পারে, তা আরিয়ান শিখে নেয়।

কিছু দিন পর, আরিয়ান এক রাতে গাছটি কেটে ফেলে দেয়। আগুনে পোড়ে সেই স্মৃতির গাছ, আর সব স্মৃতির বিপর্যয় ঘুচে যায়। তবে, তার কাছে একটি পাতা ছিল, যে পাতা ছিল অতীতের ক্ষীণ আলো– যা এখনো বয়ে চলেছে অতীতের হাহাকার।

আরিয়ান তার ডায়েরিতে লিখেছিল– 'আমরা সময়ের ভেতরই বাঁচি। কিন্তু সময় দেখতে হলে সাহস লাগে। কারণ স্মৃতি শুধু জানায় না কে ছিলাম, বরং সে প্রশ্ন তোলে– কে হবো আমরা?'

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন লালনকন্যা ফরিদা পারভীন

কনক হোসেন

‘খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়’ গানের কথার মতোই পাখিশূন্য হলেন কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীন। যার কণ্ঠের সুবাদে এমন অসংখ্য গান প্রাণ পেয়েছিল বিশ্বজুড়ে। ১৩ই সেপ্টেম্বর রাত ১০টা ১৫ মিনিটে এই লোকশিল্পী মারা গেছেন। মৃত্যুকালে শিল্পীর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি স্বামী এবং ৪ সন্তান রেখে গেছেন। ফরিদা পারভীনের মৃত্যুর খবরটি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশীষ কুমার চক্রবর্তী। এই হাসপাতালেই শিল্পী লাইফ সাপোর্টে ছিলেন ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে।

১৯৫৪ সালে ৩১শে ডিসেম্বর নাটোরের সিংড়া থানায় জন্ম নেওয়া ফরিদা পারভীন গানে গানে কাটিয়েছেন ৫৫ বছর। ১৪ বছর বয়সে ১৯৬৮ সালে ফরিদা পারভীনের পেশাদার সংগীত জীবন শুরু হয়। ক্যারিয়ারের শুরুতে দেশাত্মবোধক গান গাইলেও ফরিদা পারভীনের পরিচয় গড়ে ওঠে লালনকন্যা হিসেবে। তাঁর কণ্ঠে ‘মিলন হবে কত দিনে, ‘অচিন পাখি’ গানগুলো আজও বাঙালির চেতনার অংশ হয়ে আছে।

সংগীতে অবদানের জন্য ১৯৭৮ সালে একুশে পদক পেয়েছেন ফরিদা পারভীন। জাপান সরকার তাঁকে কুফুওয়া এশিয়ান কালচারাল পদক দিয়েছেন। ফরিদা পারভীন কেবল নিজের গান করেননি; বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে লালনের গান শিখিয়েছেন। তাঁর উদ্যোগে খোলা হয় অচিন পাখি স্কুল, যেখানে শিশুদের শেখানো হয় আধ্যাত্মিক শক্তির মর্ম ও গান।

ফরিদা পারভীনের গানের হাতেখড়ি মাগুরা জেলায়। সেটা ১৯৫৭-১৯৫৮ সালের কথা, তখন তিনি মাত্র চার-পাঁচ বছরের মেয়ে। সে সময় মাগুরায় তাঁকে গানে হাতেখড়ি দিয়েছিলেন ওস্তাদ কমল চক্রবর্তী। এরপর যেখানেই তিনি থেকেছেন, সেখানেই বিভিন্নজনের কাছে গানের তালিম নিয়েছেন। স্বরলিপি দিয়ে নজরুলের গান হারমোনিয়ামে ও কণ্ঠে তোলার কাজটি তিনি ওস্তাদ মীর মোজাফফর আলীর কাছেই প্রথম শেখেন। ১৯৬৮ সালে তিনি রাজশাহী বেতারের তালিকাভুক্ত নজরুল সংগীতশিল্পী নির্বাচিত হন। বাংলাদেশ স্বাধীনের পর লালন সাঁইজির গানের সঙ্গে ফরিদা পারভীনের যোগাযোগ, তখন তিনি কুষ্টিয়াতে থাকতেন। সেখানে তাঁদের পারিবারিক বন্ধু ছিলেন মোকছেদ আলী সাঁই। ১৯৭৩ সালে ফরিদা পারভীন তাঁর কাছেই ‘সত্য বল সুপথে চল’ গান শেখার মাধ্যমে লালন সাঁইজির গানের তালিম নেন। মোকছেদ আলী সাঁইয়ের মৃত্যুর পর খোদা বক্স সাঁই, ব্রজেন দাস, বেহাল সাঁই, ইয়াছিন সাঁই ও করিম সাঁইয়ের কাছে লালন সংগীতের তালিম নেন।

লালন সাঁইজির গানের বাণী ও সুরকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে ফরিদা পারভীনের অবদান সর্বজনস্বীকৃত। শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বদরবারেও তিনি লালন সাঁইয়ের বাণী ও সুরকে প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। জাপান, সুইডেন, ডেনমার্ক, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ আরও বহু দেশে লালন সংগীত পরিবেশন করেছেন। লালন সংগীতে অবদানের জন্য ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের একুশে পদক পান ফরিদা পারভীন। এর বাইরে ১৯৯৩ সালে *অন্ধ প্রেম* চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত ‘নিন্দার কাঁটা’ গানটির জন্য শ্রেষ্ঠ সংগীতশিল্পী (নারী) হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন। তিনি ২০০৮ সালে জাপানের ফুকুওয়াকা পুরস্কার লাভ করেন। লালনশিল্পী হিসেবেই সুপরিচিত হন, তাঁর কণ্ঠে বেশ কটি আধুনিক ও দেশের গান জনপ্রিয় হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য- ‘তোমরা ভুলে গেছ মল্লিকাদির নাম’, ‘এই পদ্মা এই মেঘনা’ ইত্যাদি।

ফরিদা পারভীনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। এক শোকবার্তায় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, নজরুলগীতি, দেশাত্মবোধক নানা ধরনের গান করলেও শ্রোতাদের কাছে ফরিদা পারভীনের পরিচিতি ‘লালনকন্যা’ হিসেবে। পাঁচ দশক ধরে তাঁর কণ্ঠে লালন সাঁইয়ের গান মানুষের হৃদয় ছুঁয়েছে। তাঁর গান আমাদের সংস্কৃতির অন্তর্লীন দর্শন ও জীবনবোধকেও নতুন মাত্রায় তুলে ধরেছিল। প্রধান উপদেষ্টা ফরিদা পারভীনের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। ফরিদা পারভীনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। এক শোকবার্তায় উপদেষ্টা বলেন, ফরিদা পারভীনের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আমি মরহুমার আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

প্রয়াত সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে তাঁর মরদেহ ১৪ই সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টার দিকে কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে নেওয়া হয়। শহিদমিনারে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান সর্বস্তরের মানুষ। এরপর কুষ্টিয়ায় মা-বাবার কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

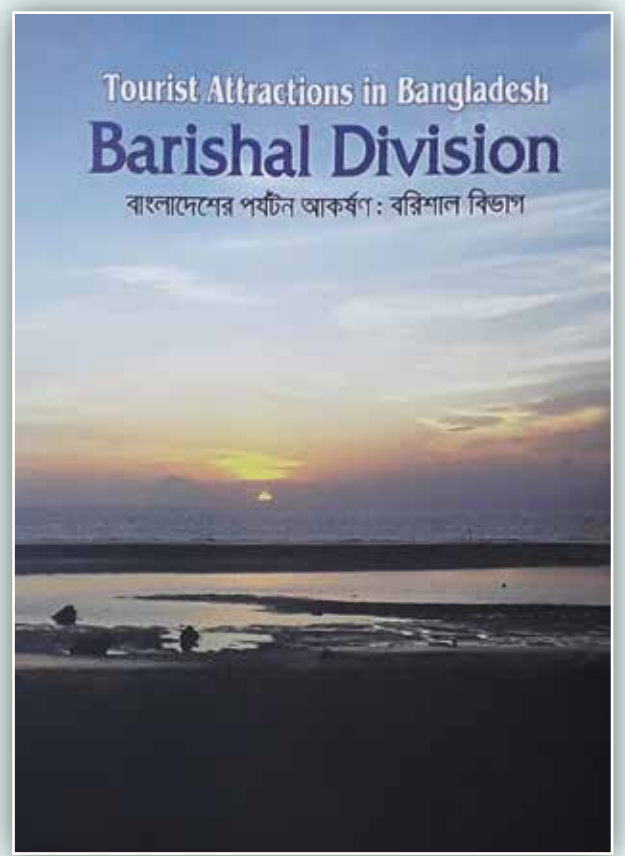
Tourist Attractions in Bangladesh
Barishal Division
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ

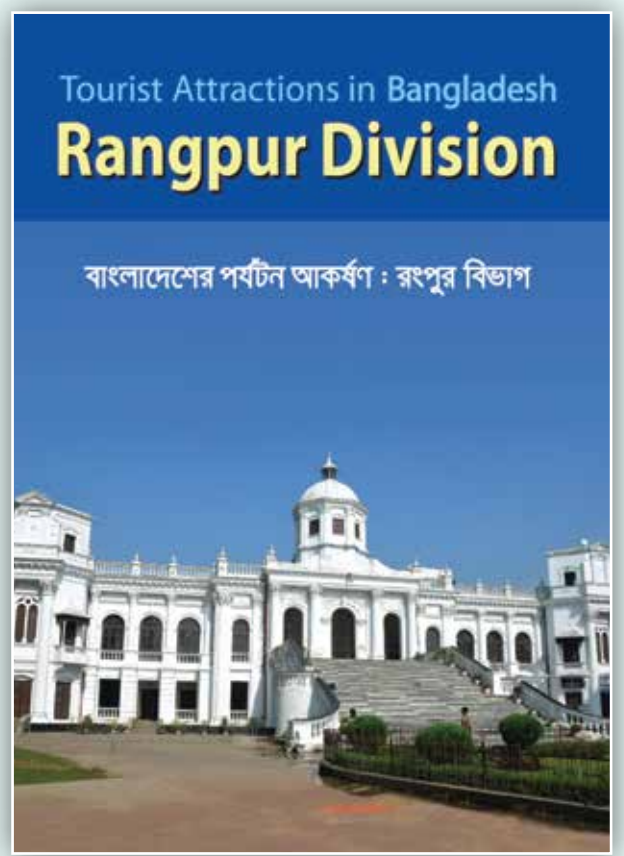
Tourist Attractions in Bangladesh
Rangpur Division
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : রংপুর বিভাগ

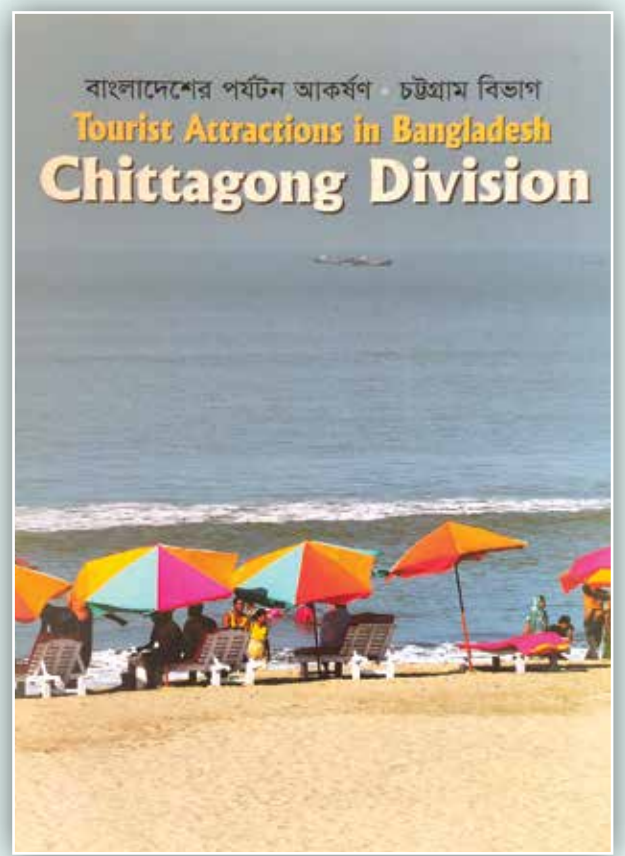
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ • চট্টগ্রাম বিভাগ
Tourist Attractions in Bangladesh
Chittagong Division

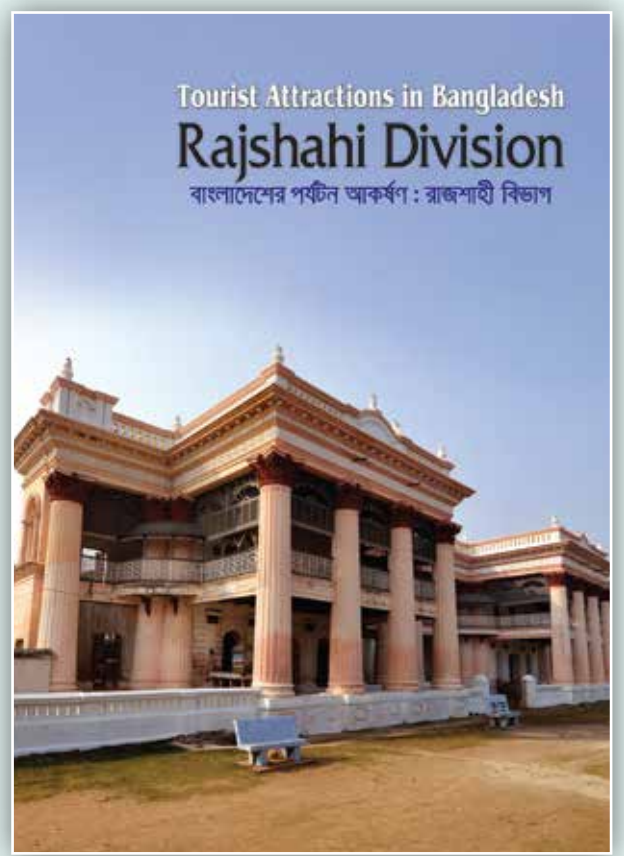
Tourist Attractions in Bangladesh
Rajshahi Division
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : রাজশাহী বিভাগ

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 46, No. 03, September 2025, Tk. 25.00

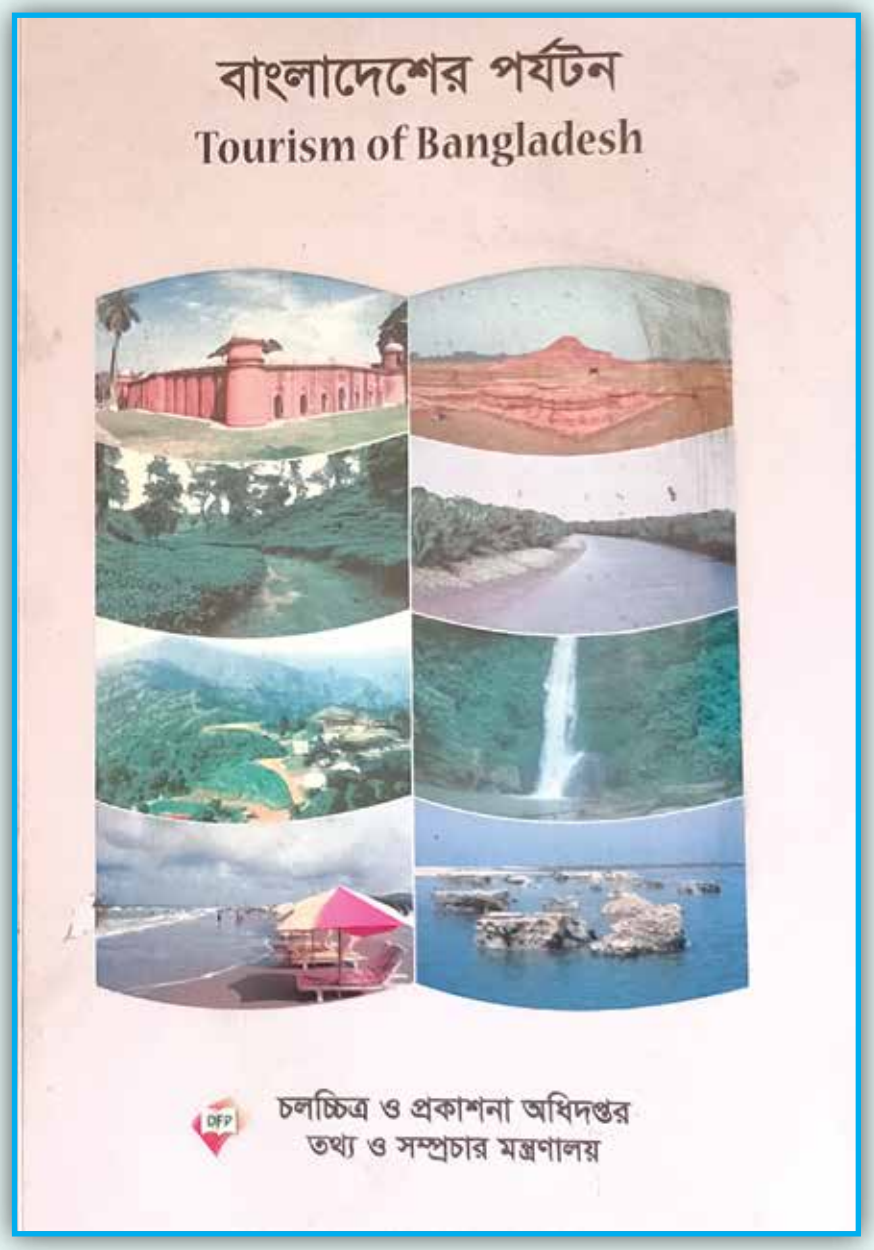

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd